তপোময় তুষারতীর্থ

সুকৃতি রায়চৌধুরী

তপোবন তুষারতীর্থ

প্রথম প্রকাশ
মহালয়া, ১৩৬৭

প্রকাশক
সুনীল চন্দ্র রায়চৌধুরী
পূর্বাচল প্রকাশনী
১৫, কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা

প্রাপ্তিস্থান
দি বুক হাউস
১৫, কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা

মুদ্রাকর
চণ্ডীচরণ সেন
পি. বি. প্রেস
৩২ই, ল্যান্সডাউন রোড
কলিকাতা—২০

ফটো
বেঙ্গল ফটোটাইপ কোং

মূল্য
চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

ভূমিকা

শ্রীমান স্বকৃতি রায়চৌধুরীর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। তিনি যে সকল স্থান ভ্রমণে গিয়াছিলেন, সে সকলের বিবরণ পূর্ব্বেও একাধিক লেখক লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তরুণের যে উৎসাহ ও অনুসন্ধিৎসা, যে অস্থিরতা ও সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা ইহাকে ঘর ছাড়িয়া কষ্টকর ভ্রমণে প্ররোচিত করিয়াছিল, তাহার প্রভাব বৈজ্ঞানিকের বা ধর্ম্মজ্ঞানরতের রচনায় পাওয়া যায় না। সেইজন্য ইহার রচনা বৈশিষ্ট্যগুণসম্পন্ন—নূতনত্বে পুষ্পিত। ইহার রচনায় আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয়—ইহার রচনার ভাষায়ও ঐ উৎসাহের ও অস্থিরতার প্রভাব লক্ষিত হইয়াছে। সেইজন্য ভাষা পাঠককে আকৃষ্ট করে—ভাবের ও ভাষার সম্মিলন ও সমন্বয় অনেক স্থানে পাঠককে মুগ্ধ করে।

তিনি যে স্থানসকলের বর্ণনা করিয়াছেন, সেগুলি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ এবং হয়ত সেই কারণেই হিন্দুর তীর্থক্ষেত্র হইয়াছিল। সে সকলের সৌন্দর্য্য তিনি রচনায় চিত্রিত করিতে পারিয়াছেন। তাহা অল্প দক্ষতার পরিচায়ক নহে। ভাষা সরল ও স্বচ্ছ—ভাবের উপযুক্ত বাহন হইয়াছে। আমি এই তরুণ সাহিত্যিককে সাদরে সাহিত্যতীর্থে স্বাগত বলিতেছি।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

আমার কথা

অতি অল্পই। বরফ, পাহাড়, নদীর গানের আসরে মন্দিরের ইতিবৃত্ত ও বিগ্রহ বন্দনার সুর সাধতে গিয়ে অনুভব করি তত্ত্ব আর তথ্যের ছন্দ-লয় বুঝি আপনা হতেই এসে পড়ে। স্বাভীষ্টকে পাওয়ার পরমব্রত নিয়ে পথ চলতে চলতে পরমতত্ত্বেরও সন্ধান মিলে যায়। সেই আমার পরম পাওয়া।

রিক্তমেঘ নিঃসীম নীলাকাশ, বায়ুপ্রবাহ, নক্ষত্রলোকের ব্যাপ্ত জ্যোতি, শিশিরচুম্বিত তৃণদল, শ্যামল বৃক্ষরাজি, ধূসর ধূলিকণা, এরা সবাই আমার একান্ত আপন। অনুভব করি, এদের সঙ্গে আমার জন্মজন্মান্তরের পরিচয়। প্রকৃতির কোলে আমি যেন অনাদিকালের শিশু। আমার রক্তমাংসের শরীর আর ধরণীর গৈরিক মৃত্তিকা একই ধাতুতে গড়া, একই দুঃখসুখের স্পন্দনে শিহরিত। মনে হয়, আমার দেহের উষ্ণতায় আর সূর্য্যের শুভ্রদীপ্তিতে একই মহাশক্তির প্রভাব বিরাজমান।

এই গহন উপলব্ধিকে যথাযথ ব্যক্ত করার ক্ষমতা আমার নেই—তবু তাকে প্রকাশের এই যে নম্র প্রয়াস, এই যে ব্যাকুলতা, তার মূলে আছে কল্যাণকামী সহযাত্রীদের ক্রমিক তাগিদ আর অদম্য উৎসাহদান। এঁদের প্রত্যেকের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।

প্রবীণতম সাংবাদিক শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ মহাশয় ভূমিকাটি লিখে দিয়ে আমার প্রতি তাঁর অপরিসীম স্নেহের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

শুধু ৺কেদারনাথ মন্দিরের আলোকচিত্রটি ছাড়া প্রচ্ছদের আলোকচিত্রসমেত অন্যান্য সব আলোকচিত্রগুলিই বন্ধুবর শ্রীঅমু চ্যাটার্জীর তোলা। তিনি এই বইতে সেগুলি সংযোজনের অনুমতি দিয়ে আমায় অশেষ ঋণী করেছেন। তাঁকে আমার আন্তরিক প্রীতি জানাই।

৺মহালয়া, ১৩৬৭ — সুকৃতি রায়চৌধুরী

সেজদিদিমা ও
সেজদাদামশাইকে

প্রতি মানুষের মনের মধ্যেই একসময় না একসময় পথের আকর্ষণটা প্রবল হয়ে ওঠে, কেননা মানুষের মনে বাসা বেঁধে আছে এক চিরকালীন পথিক। গৃহস্বামী চায় গৃহহারা হতে এবং গৃহী হতে চায় গৃহত্যাগী ঐ পথেরই আহ্বানে। বিশাল এই ভারতবর্ষের গিরিকন্দর, সিন্ধু, তটিনীতীর চিরউৎসুক জীবনচঞ্চল পথিকের অবিশ্রান্ত পদক্ষেপের চিহ্ন বুকে নিয়ে মানুষকে প্রলুব্ধ করে পথে বেরিয়ে পড়বার জন্যে। সেই পথ, যে পথ চিরপুরাতন হয়েও নিত্য নব, যে পথ মানুষের অন্তরে অধ্যাত্মসাধনায় জয়ী হবার বাসনাকে শাশ্বত করার ইঙ্গিত দেয়, জীবন অনুসন্ধানী করে তোলে মানুষকে। অধ্যাত্মচেতনার অন্বেষণ, অথবা ভগবৎপ্রেমের সন্ধান, অথবা জীবনের ব্যাখ্যা খোঁজার অনুশীলন চিরন্তন পথিকের হৃদয়ের অনুভূতিতে জাগিয়ে তোলে যে আনন্দের সুর, পথে আর পথের প্রান্তে যুগে যুগে হয় সেই সুরের অনুরণন। তাই পথ হয়ে ওঠে প্রিয়; চিরপরিচয়ের সাক্ষ্য বহন করে প্রিয় থেকে প্রিয়তর, প্রিয়তর থেকে প্রিয়তম হয়ে মানুষের হাত ধরে তাকে নিয়ে যায় শ্রেয়ের পানে, শাশ্বত সুন্দর আনন্দ-নিকেতনের শীর্ষে।

অধ্যাত্মসাধনা বা জীবনজিজ্ঞাসার মোহের সূক্ষ্ম ভাবপ্রবণতার কথা ছেড়ে দিয়ে এইটুকু বলতে পারি যে পথে বেরিয়েই আমার মধ্যেকার তীর্থযাত্রী, ট্যুরিষ্ট ও সাইটসিয়ার এই তিনটি সত্তা একীভূত হয়ে যায়। ভারতের 'প্রতি প্রান্তর প্রতি গুহা বন প্রতি জনপদ তীর্থ অগণন' দেখবার একটা দুরন্ত বাসনা আমায় বারবার পথে বার করেছে। ভারতের তীর্থে তীর্থে প্রিয় পরিজনের মঙ্গলকামনা জানাবার জন্যে যতটা না হোক, তার চেয়েও বেশী, বিরাট এই ধরণীর একাংশকে, সেই অংশের অধিবাসীকে নিজস্ব করে চেনবার জন্যে ছুটে গেছি

দাক্ষিণাত্যে রামেশ্বর, কন্যাকুমারীতে, এবারে এসেছি উত্তরাখণ্ডে ৺কেদার-বদরী পুণ্যধামে।

আমার মত নিম্নমধ্যবিত্ত করণিকের মধ্যেও চিরন্তন তীর্থপথ-যাত্রীর মহাপথ এই মহাপ্রস্থানের পথে রওনা হবার তীব্র বাসনাকে দেখে উৎসাহ দিয়েছিলেন আত্মীয় বন্ধুরা। গুরুজনদের আশীর্ব্বাদ আর প্রিয় পরিজনের শুভেচ্ছাকে পাথেয় করে, কলকাতা থেকে বৈশাখের খররৌদ্রের প্রচণ্ড দাহ হতে তপোময় তুষারতীর্থের কমনীয় প্রশান্তির রাজ্যের প্রবেশপথ হরিদ্বারে পৌঁছে গেলাম এক সন্ধ্যায়।

বাড়ী থেকে বেরিয়েছি একা, অথচ হরিদ্বারে একা নামতে হয়নি। ট্রেনে এক এক করে পরিচয় লাভ করেছি সহযাত্রীদের সঙ্গে। জনশ্রুতি, বাইরে না বার হলে চিত্তের প্রশস্ততা বা উদারতা বাড়ে না। কথাটা যে সত্যি, তার প্রমাণ পাই ভিন্ন ভিন্ন জায়গা থেকে এলেও, সমস্ত পরিবারের একত্রীকরণ হয়ে যাওয়ার মধ্যে, প্রমাণ পাই অপরিসর জায়গাতে সহযাত্রীর সুবিধের জন্যে নিজেকে সংকুচিত করে দেওয়ার মধ্যে, প্রমাণ পাই একের স্বার্থের বিসর্জনে অনেকের সঙ্গে মিত্রতার সূত্র দৃঢ় করার মধ্যে।

সেই হরিদ্বার। পূর্বে কর্মক্লান্ত চাকুরী জীবনের বাৎসরিক ছুটির অবকাশে একবার, আর একবার ইণ্টারভিউ দিতে দিল্লীতে আসতে হয়েছিলো। সেই সময় হিন্দু পুণ্যার্থীর স্বর্গভূমি হরিদ্বার ও সৌন্দর্য্য-পুরী হৃষিকেশ বেড়িয়ে হিমতীর্থ ৺কেদার-বদরী যাবার পায়ে হাঁটার পথটা দেখেই ফিরে এসেছিলাম। এবারে যাব সেই পথ ধরে, প্রথমে বাসে, পরে পায়ে হেঁটে।

ষ্টেশনের কাছেই সেই সুন্দর ফোয়ারা—গঙ্গাধরের জটা থেকে গঙ্গাবতরণ। হরকিপেড়ী, ব্রহ্মকুণ্ড, গঙ্গাজীর মন্দির ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে পূর্বস্মৃতি মনে পড়তে লাগল। ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানের সময় মনে হচ্ছিল মায়ের কোলে যেন বিছিয়ে দিয়েছি দেহ। বেদনা কাতর দেহে যেন তার সুকোমল হস্তের সেবার মত তরঙ্গের পর তরঙ্গ আমার

চতুষ্পার্শে ; ক্লান্তিমাখা দেহে যেন শান্তিময়ীর প্রলেপ। স্রোতের আবর্তে নাস্তিক, আস্তিক, বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী সব মানুষেরই মন ওঠে দুলে, তারপর সংশয় যায় থেমে। চঞ্চলতার পরেই স্থিতি—প্রলয়ের পরেই শান্ত পৃথিবী।

স্নানঘাটে আলাপ হল মিঃ দে'র সঙ্গে। কলকাতা থেকে এসেছেন, ওষুধের ব্যবসায়ী। উনিও যাচ্ছেন ৺কেদারবদরী।

স্নান সেরে ফেরবার সময় হঠাৎ এক ভদ্রলোক কিছু অর্থসাহায্য প্রার্থনা করলেন। একে বাঙালী, তায় বিদেশে। তাকে পরাণ চ্যাটার্জীর কাছে নিয়ে গেলাম। পরাণ ইতিমধ্যে আমাদের গুরুজী ও গাইড হয়ে উঠেছে। প্রতিটি ব্যাপারে তার ধীরতা ও গার্জেনসুলভ সুচিন্তিত মতামত ও অভিজ্ঞতাপূর্ণ উপদেশাবলী বেশ কার্য্যকরী। সঙ্গের বন্ধু শিবনাথ ও অমল আলোচনা করছিল সীমিত অর্থ থেকে কি ভাবে বিদেশে একজনের অসহায়তা দূর করা যায়। এমন সময় স্থানীয় এক সাধু আমাদের জানালেন যে লোকটি অসৎ—ভিক্ষে করা ওর পেশা। শুনেছি দানে পুণ্য হয়। আমরা অপাত্রে দান না করার পুণ্যার্জ্জনে তাকে বিদেয় করার ব্যবস্থা করি।

পরদিন বাসে হরিদ্বার থেকে হৃষিকেশ। হৃষিকেশে তোড়জোড়। এখানে ধর্মশালায় একদিন রাত্রিবাস। খুচরো জিনিষপত্র কেনাকাটা করতে সমস্ত দিনটা গেল। বৃষ্টি থেকে বিছানাকে বাঁচাবার জন্যে রবারক্লথ এনেছি, কিন্তু বহরে কম পড়ল, তাই আরও খানিকটা নিতে হল। লাঠি কিনতে গিয়ে মনে পড়ল সাতচল্লিশের দাঙ্গায় আমার লাঠি খেলা শেখার কথা। ক্লাবে তখন পূর্ণোদ্যমে ছোরা, লাঠি, কুস্তি খেলা শেখানো হচ্ছে। উৎসাহ কম ছিল না, তাই তাঁবেচা-বাহেরা-র মন্ত্রে আত্মরক্ষা করতে হয় কি করে, শিখে ফেলেছিলাম। কিন্তু হায়, কোন দুর্বৃত্তের সম্মুখীন হবার সুযোগ না পাওয়াতে শেষ পর্য্যন্ত যে লাঠিটায় খেলা শিখেছিলাম, সেটা বর্তমানে বাড়ীতে বেড়াল তাড়ানোর

কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। নীচে লোহা বসানো একটি পছন্দমত লাঠি কিনলাম।

পরিচিতের গণ্ডি বেড়ে চলে। ধর্মশালায়, বাজারে, বাসষ্টাণ্ডে আলাপ হয় যাত্রীদের সঙ্গে। প্রত্যেকের ভাবগম্ভীর মুখে যেন একটা স্থির সংকল্প গ্রহণের চিহ্ন। আত্মপ্রত্যয়ের ছবি সকলের চোখে। সামনে যেন এক বিরাট পরীক্ষা—অপরাজিত মন আর দৃঢ় সংকল্প নিয়ে সে পরীক্ষাতে জয়ী হবার জন্যে যেন প্রস্তুত সবাই। বাড়ীতে যে সমস্ত ঠাকুরমা দিদিমাদের কোনদিন কেড্‌স্‌ বা অন্য কোন জুতো পায়ে দিতে দেখিনি, এখানে দেখি জুতো পায়ে দিয়ে ঘুরছেন তাঁরাই। কেমন যেন দেখতে লাগে। পাঁচ আর ছয় নম্বরী কেড্‌স্‌জুতো কয়েক হাজার বিক্রী হয় এসময়ে।

কলকাতা থেকে এসেছেন বিখ্যাত ব্যবসায়ী 'ম' বাবু। সঙ্গে এসেছেন পরিবারের অনেক স্ত্রী ও পুরুষ, এসেছে কয়েকজন চাকর পাচক। ধর্মশালার প্রায় সব ঘরগুলি এদের অধিকারে। আমরা চারজন আছি কাছাকাছি একটা ঘরে। সঙ্গের তিনজন ট্রেন থেকেই কেউ হয়েছেন বন্ধু, কেউ পরামর্শদাতা, কেউ ভাই। আপনি আপন হয়েছে তুমিতে এসে।

'ম' বাবুর সঙ্গে আলাপ হল। কথায় কথায় জানা গেল, ওর সঙ্গের লোকেরা সবাই ওর পরিবারভুক্ত নয়। ওর মধ্যে আছে পরিবারের বন্ধু, আছে বন্ধুর পরিবার, আছে পরিবারের বন্ধুর বন্ধু, আছে বন্ধুর পরিবারের বন্ধু।

উনি বললেন, আপনারাই বা কেন আলাদা যাবেন। চলে আসুন আমার দলে। খাওয়া থাকার বন্দোবস্ত আমার। কুলী পর্য্যন্ত ঠিক করে দোব, কিছু ভাবতে হবে না।

টাকার অঙ্ক শুনে গুরুজী রাজী হল। গুরুজীর রাজী হওয়া মানেই আমাদের রাজী হওয়া। সামান্য দক্ষিণায় এতখানি নির্ঝঞ্ঝাট হওয়া যাবে ভাবিনি।

রাত্রে খাবার পর 'ম' বাবু ওর পরিবারস্থ হয়ে যে বিরাট দলটি চলেছে, তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, তোমরা ইয়ংম্যান থাকতে আমার ভয় কি।

পরিচয় শেষে অমল বললে, এত নাম মনে থাকবে না। তারচেয়েও বরং বিশেষত্ব দিয়ে বিশেষকে চেনা থাক।

'ম' বাবু বললেন, কি রকম?

এই যেমন ইনি আমাদের গুরুজী।

কিন্তু রেফারেন্সে অসুবিধে হবে যে!

'ম' বাবুর কথার উত্তরে এবার শিবনাথ বললে, প্রথম প্রথম একটু কনফিউশন হবে, কিন্তু সমাধানের চাবি আপনার কাছে।

তার মানে?

মানে নাম ঠিকানার লিষ্ট। মিলিয়ে নেবেন।

একগাল হেসে 'ম' বাবু বললেন, তা বটে। কিন্তু কথা হচ্ছে, নামকরণ করবে কে?

রায় দিলে গুরুজী, যে যখন যেমনটি দেখবে সঙ্গে সঙ্গে করবে নামকরণ। কি বল থীরুমল?

চোখ পড়ল অমলের দিকে।

নতুন নাম পেয়ে অমল বললে, নিশ্চয়ই।

'ম' বাবু কিছুতেই নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না।

বললেন, আর যার বিষয়ে তেমন কিছু চোখে পড়বে না?

ছেদ টানি আমি, সে থাকবে নেপথ্যে। তবে একটা কথা, এটা সকলের মনে রাখা দরকার যে কারও প্রতি কটাক্ষপাত করে তাকে হেয় করা উদ্দেশ্য নয়। একই পথে যাত্রী আমরা বৈচিত্র্যের মধ্যেই নির্মল আনন্দ পেতে চাই। দয়া করে ভুল বুঝবেন না।

থীরু বললে, এক্সাক্টলি।

দেখলাম কথাটা অনেকেরই ভাল লাগল। কার কি নাম হবে কেউ জানে না। বিশেষত্ব দিয়ে বিশেষ করে চেনা—মুদ্রাদোষ হতে

পারে, হতে পারে পোষাকে বিশেষত্ব, আরও কত কি হতে পারে। মনে মনে সবাই কৌতুহলী হয়ে রইল।

খাবার পর শোওয়া। যারা সতরঞ্চি বা কম্বল বিছিয়ে খাটিয়ায় অগ্রাধিকার চিহ্নিত করে গেছেন তারা সে অধিকার বজায় রাখলেন। আরও অনেকের মত গুরুজীর আর আমার বিছানা হল মেঝেতে। 'ম' বাবুর দায়িত্বজ্ঞান অসীম। সবাই খাওয়াদাওয়া সেরে নিল কি না, প্রত্যেকে শুতে পেল কি না, দেখতে দেখতে উনি আমাদের কাছে এলেন।

বললেন, যারা মেঝেতে শুয়েছেন তারাই চালাক। পথে তো আর খাটিয়া মিলবে না, তাই আগে থেকে অভ্যেস করে রাখছেন।

গুরুজী বললে, তা নয়। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরীয়সী। মায়ের কোলে শুয়ে থাকার একটা আনন্দ আছে।

ডাক্তারবাবু বললেন, কিন্তু মা যে বড় ঠাণ্ডা।

'ম' বাবু বললেন, ভয় কি, আপনাকে সঙ্গে নিয়েছি কি মিছেমিছি। আপনার থীরুমল আর তার সঙ্গী কোথায়, ও গুরুজী।

থীরুমলের সঙ্গী শিবনাথ।

শিবনাথ ঘুমুচ্ছে ওদিকে ভীমের পাশে, গুরুজীর জবাব।

ভীম?

ঐ যে বালীগঞ্জ থেকে ওর মাকে নিয়ে এসেছে।

নিত্যানন্দের কথা বলছেন?

হ্যাঁ। ও এখন থেকে আমাদের পঞ্চপাণ্ডবের একজন।

ভাল কথা। আর থীরুমল কই?

জবাব দিলাম আমি, সে গেছে ছাতে।

কেন?

ওর খাটিয়ায় খাটমল প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীর সভ্যরা ওকে নমিনেশন দেয়নি।

খাটমল মানে ছারপোকার ভয়ে ছাতে—বলে হো হো করে হেসে

ওঠেন 'ম'বাবু। তারপর বললেন, কিন্তু ঠাণ্ডায় ছাতে যে ছাতু হয়ে যাবে। দেখি আবার।

সিঁড়ির দিকে গেলেন 'ম' বাবু। ডাক্তারবাবুকে আমরা সঙ্গে রাখতে চাই। কিন্তু বলি কি করে সে কথা ওঁকে।

ওপাশে শিবপুরের মামীমাকে তার ভাগ্নে জুতোমোজা পরার সুবিধের কথা বোঝাচ্ছেন।

কুমারডুবী থেকে এসেছেন শ্রীকুমার। উনি বললেন, তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ুন। ভোরে রওনা হতে হবে।

ওকে সায় দিলেন হোমিওপ্যাথী ডাক্তার। ইনি কারো সঙ্গে বড় একটা মেশেন নি।

একে একে নিভিল দেউটি। ধর্মশালার কম পাওয়ারের ইলেকট্রিক বাতির রেশনকরা আলো। তাও নিভে গেল। একটি মোমবাতি তখনও জ্বলছে। দেখি, বালিশের ওপর উবু হয়ে কে যেন কি লিখছে।

থীরু বললে, বলতে গেলে যাত্রা শুরুই হয়নি। এখন থেকে রাত জেগে ডায়েরী লেখা!

উত্তর দিলেন উনি, ডায়েরী নয়, মানে ইয়ে—

বোলপুরের শান্তিদিদি বললেন, ইয়ে কেন, বলেই ফেলো না ঠাকুরপো। পই পই করে বললুম, ওরে সঙ্গে নিয়ে চল। কথা শুনলে না, এখন রাত জেগে চিঠি লেখা।

ধরা পড়ে গিয়ে ঠাকুরপো বোধ হয় লজ্জা পেলেন। মোমবাতি নিভে গেল।

কাক ভোরে উঠেছে সবাই। জিনিষপত্র বাঁধাছাঁদা সুরু হয়ে গেছে। বাসষ্টাণ্ডে যেতে হবে না। 'ম' বাবু বন্দোবস্ত করেছেন ধর্মশালার দোরগোড়া থেকে সওয়ারী ও মাল তুলবে বাস। গাইডবুক আর ভ্রমণকাহিনী পড়ে আমরা মোটামুটি জেনে ফেলেছি পথের বিবরণ, সুবিধে অসুবিধের কথা। বেশী মাল নেওয়া চলবে না। বিছানাপত্র

আর সামান্য জামাকাপড় যাবে হোল্ডলে, হাতব্যাগে থাকবে প্রয়োজনীয় জিনিষ, আর এ সব যাবে কুলীর মাথায়। গুরুজী সকলের প্রয়োজনে লাগবে এমন জিনিষ সব ভাগ করে দিলে। ঠিক হল, থীরুমল বইবে ওর ভারী ও দামী রোলিফ্লেক্স ক্যামেরা আর বাজনা। ও আমাদের ষ্টাণ্ড-বাই। মধ্যমপাণ্ডবের কাছেও ক্যামেরা। সে নেবে একটা ওয়াটার বটল। গুরুজী নেবে দ্বিতীয় ওয়াটার বটল ও মগ। শিবনাথ নেবে কিটব্যাগ. যাতে থাকবে তেল, সাবান, আয়না, টয়লেট, গামছা, ওষুধ, লেমন স্কোয়াস। আর একটা কাজের ভার পড়ল তার ওপর। চটিতে বিশ্রাম নেবার পর রওনা হবার আগে ও দেখে নেবে কেউ কিছু ফেলে গেল কি না। ও হল আমাদের চট্টি চ্যাটার্জী। আমার অবস্থাও থীরুমলের মতো। বই, খাতাপত্র আর ক্যামেরায় আমার সঙ্গের ভারটাও কম নয়। আমার কাছে এল মিছরী, মেওয়া. লজেন্স।

'ম' বাবু রকমসকম দেখে বললেন, এ মন্দ নয়। কেউ কাউকে ছেড়ে এগিয়ে যেতে পারবে না।

তা নয়। পায়ে ঘোঁড়ার খুর বসিয়ে নিয়েছে যারা, তাদের কি আর ধরে রাখতে পারব। তবে ছিটকে যেন বিপথে বা বিপদে না পড়ে।—জবাব দেয় গুরুজী থীরুর দিকে চেয়ে। থীরু হাসল।

আমার পকেটে শিশি দেখে ডাক্তারবাবু বললেন, ওটা আবার কি? টোটকা নাকি?

হেসে বলি, ঠিক ধরেছেন, আপনার অস্ত্র গেল। এ হচ্ছে পাঞ্জাবের তানসেন গুলি।

কুমারডুবীর শ্রীকুমার বললেন, ভাস্কর লবণ নিয়েছেন তো?

মধ্যমপাণ্ডব বললে, আমি একটু বেশী খাই। ওটা আমার কাছেই থাক।

চট্টি চ্যাটার্জী বললে, সর্বনাশ! ও গুলি খেলে পেটের ব্যামো তো সারবেই না, উল্টে হাঁটুর ব্যথা যাবে বেড়ে, মাথার ব্যথাও যাবে বেড়ে। কোথাকার জিনিষ কিছু ঠিক আছে।

সবাই হেসে উঠল ওর কথা শুনে।

'ম' বাবুর সহকারী বটকেষ্ট খবর দিয়ে গেল, রসগোল্লার টিন যাচ্ছে মুখোপাধ্যায়দার সঙ্গে।

থীরু বললে, রসগোল্লাদার অমন চেহারায় তো রসের অভাব নেই, এর ওপর আবার কেন টিন বয়ে নিয়ে চলেছেন।

গুরুজী বললে, ' রস একা উপভোগের বস্তু নয়। আমাদের মত বেরসিককে রসসিক্ত করতে পারলে, তবেই না রস লাগবে মিষ্টি।

থীরু বললে, পথে রসগোল্লাদাকে জানিয়ে দোব, ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান।

ঠিক ঠিক,—সায় দিল সকলে।

বাস এবারে হর্ণ দিতে স্থুরু করেছে। আমাদের স্থুটকেশ আদি জিনিষপত্র ধর্মশালায় রেখে এক এক করে বাসে গিয়ে বসি। জিনিষ-পত্র যা রইল, তা থাকবে ধর্মশালার একটা ঘরে চাবি দেওয়া। 'ম' বাবু তদারক করছেন, সবাই বসতে পেল কি না, সমস্ত জিনিষ উঠল কি না। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে বাসে গিয়ে বসেন তিনি। কুলী, ছড়িদারেরাও বসল। থীরু মাউথঅর্গানে স্থুর ধরল, 'মোদের যাত্রা হল স্থুরু'। কোরাস ধরল অন্যান্য সবাই। আনন্দ বিহ্বল, আশা উদ্বেল হৃদয়ে যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে বলে উঠলাম, 'জয় কেদার জয় বদরী বিশাল'।

হৃষিকেশ থেকে শ্রীনগর। বটকেষ্টর সঙ্গে অ্যাডভান্স পার্টির জনকয়েক লোক আর একজন ছড়িদার আগেই রওনা হয়ে গেছে রান্না ও বাসস্থানের তদারকী করতে। আগে লোকে হৃষিকেশ থেকে হাঁটা স্থুরু করত। তারপর ক্রমে ক্রমে ইউ. পি. সরকারের ব্যবস্থাপনায় পাহাড় কেটে রাস্তা তৈরী হয়েছে। আমাদের বাস চলেছে হেলে দুলে পাহাড়ের কোলে কোলে। ড্রাইভার হর্ণ বাজাচ্ছে গাঁক গাঁক করে আর পথের লোক দু পাশে সরে যাচ্ছে। পেছনে পড়ে রইল লোকালয়।

ছেলেবেলায় ঠাকুরমা দিদিমাদের মুখে হরিদ্বার, হৃষিকেশ নাম শুনলেই মনে হত, এ জায়গাগুলি বুঝি কেবলই সাধুসন্ন্যাসী অধ্যুষিত। একদিন হয়ত তাই ছিল, ক্রমে ক্রমে এর চেহারা পাল্টাতে থাকে। পরিবর্তনের হার যে ভাবে নজরে পড়ছে, তাতে মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে এসব জায়গা হয়ত ট্যুরিষ্ট প্যারাডাইস হয়ে উঠবে। নাইট ক্লাব, বার, এসবও হয়ত হবে। তবে স্থায়ী হতে পারে না এটা, কেননা আমি লক্ষ্য করেছি প্যাণ্ট, কোট, গগল্‌স্‌, ক্যামেরার মধ্যে থেকেও ভারতবর্ষের অধিবাসী তার সেই অনাদিকালের ধর্মপিপাসু মনটাকে লুকিয়ে রাখতে পারছে না। আমি দেখতে পাচ্ছি স্পষ্ট, হাওয়াই সার্টের বিচিত্র বর্ণ একদিন আবার নামাবলীর ছাঁচে রূপান্তরিত হবে। কালের ব্যবধান আনে রুচির বিবর্তন, কিন্তু তার জন্যে চিরকালের জিনিষকে দূরে ফেলে রাখা যাবে না বেশীদিন। সর্বভূতে যিনি বিদ্যমান, চিরকল্যাণময় যিনি, তাকে ভোলেনি আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা, যোগীতপস্বীরা। অধ্যাত্মসাধনার বীজ আমাদের রক্তে রক্তে, সে কথা অস্বীকার করে লাভ কি!

গঙ্গার ধার দিয়ে রাস্তা। পথ ক্রমশঃ উঁচুর দিকে, তাই বিপুল বিক্রমে বাসের তর্জন, গর্জন, আস্ফালন।

নীচে কলস্বিনী গঙ্গা উদাত্ত কণ্ঠে বুঝি স্বাগত জানায় যাত্রীদের। বলে, তোরা যদি দেখবি তো আয় আমার সঙ্গে। আমি এসেছি সেখান থেকে, সে অমৃত লোক থেকে। আমি রেখে এসেছি চিহ্ন সেথায়। যে নামে যেখানেই প্রকাশিত হই না কেন, আমিই পথ। বলেই ছুটে পালায় সেখান থেকে, নেমে যায় লোকালয়ের টানে, জলধারার গানে, সমতলের পানে। বুঝি ডাক দিতে যায় ঘুমিয়ে থাকা সেই সব লক্ষ লক্ষ দেশবাসীকে, নিত্য বিষয়ের মোহজালে জড়িয়ে থেকে ঘুমোয় যারা, নিসর্গ প্রীতির অঞ্জন নেই যাদের চোখে, নন্দন-লোক যাদের কাছে একটা প্রহেলিকা, একটা এনিগ্‌মা।

পাহাড়ী পথে বাসে চাপা এই নতুন নয় অনেকের কাছে। তবু

দেখা গেল গা বিড়িয়ে উঠে, গা-বমি ভাব আসে অনেকের। বোষ্টমাসী (বৈষ্ণব মাসী) প্রথম সুরু করলেন, আর অমনি একধার থেকে জাহাঙ্গীর, নূরজাহান, সাধুমা, চট্টি চ্যাটার্জী সবাই সুরু করল বমি করতে। ধীরুমল, গুরুজীও বাদ গেল না।

কুমারডুবীর শ্রীকুমার বললেন, তানসেন ভাই, গুলি ছাড়ুন।

মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীটের মুক্তোদাদা বললেন, তানসেন গুলি নয়, লবঙ্গ চলুক। আর লেবু হাতে নাও সবাই, শুঁকতে শুঁকতে চলো।

আমাকে আর তানসেন গুলি বার করে দিতে হল না।

আঁকাবাঁকা পথে বাস চলেছে অনেকগুলি সারবন্দী হয়ে। মাঝে মাঝে দম নিচ্ছে বাস ষ্টপে এসে। ওয়ানওয়ে রাস্তা। লাইন ক্লিয়ার পাবার জন্যে অপেক্ষা করতে হয়। সেই সময়টুকু যাত্রীরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। চা, পুরী, পকোড়ী চলে ইচ্ছেমত। আমি নেমে অন্যান্য যাত্রীদের দেখতে যাই। যাদের 'ম' বাবু নেই, তারা কেমন ভাবে যায় দেখি। একটি বাসে মিঃ দে-কে বসে থাকতে দেখি।

আস্তে আস্তে অনুভব করছি বাতাসটায় শৈত্যের ভাব। কলকাতায় মানুষ। লোকালয় বলতে বুঝি, যেখানে পথ চলতে প্রতি পদে ধাক্কা খেতে হয় অপরের সঙ্গে। এ বাড়ীর ধোঁয়া ও বাড়ীতে ঝুল ধরিয়ে দেয়। অপরের নাকে নস্যি ঠেসে না দিলে নস্যি নেওয়া যায় না। আর এখানে! দূরে দূরে এক একটি ছায়াঘেরা গ্রাম। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে একটুখানি যব জোয়ারের ক্ষেত। কেমন একটা নিরুদ্বেগ প্রশান্তি ঘিরে থাকে ঝাউ আর দেবদারু ঠাসা বনে, ঘন বাবলার জঙ্গলে। মানুষ কই!

বাস দেবপ্রয়াগে এল। ভাগীরথী আর অলকানন্দা, এই দুই নদীর সংগম এই দেবপ্রয়াগ। গঙ্গার উৎপত্তি নয়, গঙ্গা নামটার উৎপত্তি এখানে। সংগমে স্নানের লোভ ষোলর ওপর আঠার আনা, কিন্তু একে প্রায় বিয়াল্লিশ মাইল বাসের দুলুনীতে ক্লান্ত, তারপর অনেক নীচে নামতে হবে, তাই নামল না অনেকে।

ক্যামেরার কাজ চলে টুকটাক। মগ আর গামছা নিয়ে নেমে পড়ি।

অফিসে একদিন লিফট্ খারাপ হলে মাথায় বাজ পড়ে। আর আজ, অক্লেশে নেমে চলেছি প্রায় চারতলা নীচে। আমি একা নই, সবাই। এক একবার ভাবি, এত শক্তি আসে কোত্থেকে। একি স্থান মাহাত্ম্য না কি অন্য কিছু!

পয়সা চায়—পাই পয়সা, ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা। ঘাটের কাছে আস্তানা কয়েকজন সাধুর। অন্যান্য ভারতীয় যাত্রীর সংখ্যা কম নয়। বপুষ্মতী রাজস্থান-বালা ঘোমটায় মুখ ঢেকে ফিরছে সংগম স্নান সেরে। কপালে বেশ খানিকটা চন্দন লেপা, হাতে পূজার থালা। বুঝলাম পূজার্চনাদিও হচ্ছে। পাণ্ডার সহাস্য মুখ তার যজমানের কাছ থেকে মোটামুটি কিছু প্রাপ্তির আশায় সমুজ্জ্বল।

স্নানের আগে বেশ খানিকক্ষণ জলের দিকে চেয়ে বসে রইলাম। প্রচণ্ড বেগে প্রলয় নাচন নাচতে নাচতে জলধারা ছুটে চলেছে। স্পর্শে হাত হয় অবশ। শীতল কিন্তু স্নিগ্ধ।

গুরুজী চীৎকার করে বললে, ঠাণ্ডা লাগিয়ো না।

কোনমতে স্নান সেরে উঠে আসছি, তখন দেখি অনেকে ঘটি হাতে নামছেন।

এলাহাবাদের পিসীমা বললেন, সংকল্পটা সেরে আসি বাবা। পিণ্ডদানের তো আর সময় পাবো না। বলেই তরতর করে নেমে চললেন। ওঁর পেছনে সম্ভ্রান্ত পরিবারের বৌ, আমাদের বৌরাণী।

বললাম, এ কি, এত আয়োজন কিসের। বাস ছাড়বার সময় হয়ে এল যে।

হাতের পূজোর উপকরণ দেখিয়ে উনি হেসে বললেন, আমাকে ফেলে চলেই যদি যায়, যাক। আমি পরের বাসে ঠিক জায়গা করে নেবো।

দেবদ্বিজে বৌরাণীর ভক্তি দেখে মুগ্ধ হয়ে যাই।

অনেক সাধুর ভীড় এখানে। এখান থেকে ক্রমশ সাধুর সংখ্যা বাড়তে থাকে। দেখলাম চিরবৈরাগ্যব্রতী কত সন্ন্যাসী! অপ্রাপ্যকে পাবার সাধনায় কেউ জীবন উৎসর্গ করেছেন, কেউ বা মৃত্যুঞ্জয় দেবতাত্মাকে পাবার জন্যে ক্লান্তিহীন তপস্যায় নিযুক্ত। ইচ্ছে করছিল আলাপ করবার, জানতে ইচ্ছে করছিল অনেক কিছুই। সময়াভাবে ইচ্ছেকে দমন করতে হল। আমাদের পাণ্ডার নিবাস এখানেই।

রোদ চড়া হয়েছে। ক্ষিদেও পেয়েছে। 'ম' বাবু খাবারের প্যাকেট বার করে দিলেন সবাইকে। ড্রাইভার থীরুকে পাশে ডেকে বসিয়ে মাউথঅর্গান বাজাতে অনুরোধ করে।

আবার চলল বাস। এবারে চব্বিশ মাইল পথ। খাদটিকে একবার ডানদিকে আবার বামদিকে রেখে বাস চলতে থাকে।

নদীকে দেখা যাচ্ছে বহু নীচে, কানে আসছে তার কলকল্লোল। পাহাড়ের গা জুড়ে ঘন বনরাজি নদীর দুই উপকূল ঘিরে। মাইশোরে বৃন্দাবন গার্ডেন, আর মালাবার হিল্‌স্‌-এ ঝুলোন বাগান দেখেছি। কিন্তু এখানে এ কোন শিল্পী প্রকৃতির কোলে এ বাগান করে রেখেছেন। আশ্চর্য্য সুষমা যাঁর সমস্ত কাজের মধ্যে, তাঁকে প্রণাম।

বাগনানের দিদিমা গজগজ করেন, রামচন্দ্রের মন্দির দেখা হল না, পূজো দেওয়া হল না।

দিদিমার নাতি বলে, এই পথেই তো ফিরব। তখন পূজো দিও।

কখনও ডাইনে কখনও বাঁয়ে বেঁকতে বেঁকতে বাস চলে। মাঝে মাঝে চেকপোষ্ট আছে—কলেরা, টাইফয়েড টীকা নেওয়া আছে কি না, যাত্রী গুণে গুণে পরীক্ষা করেন কর্মচারীরা। তারপর তাদের নিশানা পেলেই আবার বাস ছোটে লাফিয়ে লাফিয়ে। কুলী জংবাহাদুরকে কলেরা ইঞ্জেকশন দেওয়া হল।

কীর্তিনগর পেছনে ফেলে শ্রীনগর বাসঘাঁটিতে এসে পৌছুলাম যখন, তখন মার্তণ্ডদেবের প্রখর ধৃক্ষিজ্বালে ধরণী উত্তপ্ত। কীর্তিনগর থেকে শ্রীনগর হাঁটতে হয় না আজকাল, বাসপথেই যাওয়া আসা চলে।

একটানা বাসজার্নির উগ্র অবসাদে জর্জ্জরিত দেহ নিয়ে চলে এলাম ধর্মশালায়।

অ্যাডভান্স পার্টির বটকেষ্ট অভ্যর্থনা করল সবাইকে। মাল পড়ে রইল বাসষ্টাণ্ডে। ঘণ্টা তিনেক বিশ্রাম, তারপর ফের রওনা হতে হবে। বাগনানের দিদিমা, সিলিক ঠাকুরমা (সব সময় সিল্কের শাড়ী পরতেন), এলাহাবাদের পিসীমা এবং অন্যান্য বয়স্থাদের জন্যে জায়গা করে দিচ্ছি, কেননা আমাদের দুগুণ, তিনগুণ বয়স তাঁদের। দোতলা চটির ওপরের তলায় ছিলাম, হঠাৎ নীচে থেকে গোলমালের আওয়াজ কানে এল।

প্রৌঢ় গালিব (গালে মস্তবড় আব ছিল) উত্তেজিত হয়ে বলছেন, এ কি কাণ্ড মশাই। ৺কেদারবদরী যাচ্ছি বলে পথে মন্দির দেখবো না! এখানে কমলেশ্বর শিবের মন্দির আছে, তাছাড়া সহর বাজারও তো দেখতে হবে।

ওর কথায় সায় দিলেন খদ্দরের সার্ট ও বঙ্কুদা।

'ম' বাবু ধীরভাবে বলছিলেন, এখন সময় নষ্ট না করে, শক্তিক্ষয় না করে পৌঁছুতে হবে হিমতীর্থ ৺কেদার-বদরীতে। ফেরার পথে বরং দেখা যাবে প্রাণভরে।

যুক্তিটা ভাল, কিন্তু স্বার্থ যেখানে প্রবল সেখানে যুক্তির যথার্থতা প্রমাণিত হওয়া শক্ত। দেবদর্শনের বাসনা যদি প্রবল হয়, বেশ তো, চলে এসো দল ছেড়ে। যেটুকু সময় হাতে আছে ঘুরে এসো চটপট। গড়িমসি করলে তো কাজ হবে না। 'ম' বাবু সেটা জানেন, কেননা তিনি লক্ষ্য করেছেন এরই মধ্যে কেউ কেউ বেরিয়ে পড়েছেন মন্দির-পানে। গালিবের উষ্মাপ্রকাশের কারণটা বোঝা গেল একটু পরে। ছেলে ছোকরাদের মত স্পীড তার নেই। তার কেবলই মনে হচ্ছে ওরা বুঝি জিতে গেল। অন্ধ পরশ্রীকাতরতায় বয়সের পার্থক্যটা ভুলে যান তিনি।

হিমালয় তীর্থপথে সবাই যাত্রী আমরা। সুরলোকের আনন্দের

ক্ষুধা নিয়ে সব শিশুদের অন্তরে ঘুমিয়ে থাকা পথিকের ঘুম ভেঙেছে। স্বপ্নলোকের পথে সে এগিয়ে চলেছে। সে বুঝেছে মিছেই পিছে পড়ে থাকা। হারজিতের প্রশ্ন তো নয়, প্রশ্ন এখানে অন্য। আসল কথা, সমাজবদ্ধ মানুষ সমাজজীবনের যা কিছু মালিন্য, তাকে সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছে। হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ, সমস্ত পুরোমাত্রায় বজায় রেখে ভবিষ্য-দেবদর্শনের অহঙ্কার নিয়ে যে যাত্রী তীর্থপথে বেরিয়েছে, অন্তরের মলিনতামুক্তি তার কতটা হয় জানি না।

ভাবি, কি করে মুক্তিপিপাসু মনকে সংহত করব। অন্তর যদি না শুভ্রতার অনির্ব্বচনীয় অনুভূতিতে আলোকিত হল, শুচিশুভ্র কে ধ্যান করব কি করে। কেমন করে অনুভব করব আমার প্রসারিত বক্ষে তাঁর সীমাহীন প্রেম।

শ্রীনগর বেশ বড় জায়গা। বাসষ্টেশনকে ঘিরে মস্ত দোকান পাট। এদিক সেদিক সব ঘুরে, ফিরে এসে দেখি 'ম' বাবুকে ঘিরে বেশ একটু জটলা। গালিবকেও দেখা গেল। ধর্মশালার ঘরটি মনোমত হয়নি কারও কারও। 'ম'বাবুর পক্ষ নিয়ে কথা বলার বিপদ আছে। সত্যম অপ্রিয়ম মা বদ। গুরুজীর ইঙ্গিত পেয়ে চুপ করেই থাকি।

ভবানীপুরের রাঙাদি বললেন, সবাই আর কি করে ভাল জায়গা পাবে ভাই। 'ম'বাবুর জায়গায় নিজেকে রেখে ব্যবস্থার কথাটা চিন্তা করলে সমস্যার সমাধান হয়।

চট্টি চ্যাটার্জ্জী আর থাকতে না পেরে বললে, ভাল জায়গা অল্প, তবে ভাল লোকও বেশী নেই দলে। মুষ্টিমেয় যারা আছেন, তারা জায়গা পেয়ে গেছেন, এখন চেঁচিয়ে আর লাভ কি।

কথাটায় কাজ হল, শান্ত হলেন ওরা।

গুরুজীকে গল্প করলাম কমলেশ্বর শিবের কথা। সহস্র কমল দিয়ে শ্রীরামচন্দ্রের শিবপূজার উপাখ্যান। ফুলইন্সপেক্টরের দৃঢ়তা নিয়ে জেনে নিয়েছি পাণ্ডার কাছে। সব সময় কৌতুহল প্রকাশ না করে

সবজান্তার ভান করে ওদের জ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে কিছু রসদ বার করে নিতে পারি, সেটা ওরা জানে না।

পাঞ্জাবীর হোটেল থেকে মাংসভাত খেয়ে এল কেউ কেউ। যাবার সময় হয়েছে। আবার বাস। পেছনের সীটে বসার দরুন ইতিপূর্বে যাদের অঙ্গপরিধেয় ধূলিমলিন হয়েছে, তাদের কেউ কেউ সামনের সীটে গিয়ে বসল। হাতের ইঞ্জেকশনের ব্যথা অগ্রাহ্য করে জংবাহাদুর মাল তোলায় হাত লাগিয়েছে। অদ্ভুত কষ্টসহিষ্ণু ওরা। রোদটা মুখোমুখি পড়েছে। ধূলিসিক্ত চুলগুলিতে যেন শ্বেতবর্ণের প্রলেপ—হঠাৎ দেখলে মনে হয় পাক ধরল বুঝি চুলে। এহেন বয়সে নবীন, কেশে প্রবীণ অবস্থায় আমরা অন্যের মধ্যে নিজেদের দেখতে পেয়ে অকারণেই হেসে উঠছিলাম। বাস ছেড়ে দিল।

বাসে পাণ্ডার কাছে জেনে নিই, কেন এ জায়গার নাম শ্রীনগর হল। তারপর মুখে মুখে সেটা ছড়িয়ে পড়ে আর সবায়ের কাছে।

পাণ্ডাকে বললাম, দেখুন, আমার মতে এ জায়গাটির যে রকম বিশ্রী পরিবেশ, তাতে শ্রীনগর নামটা ঠিক হয়নি।

হেসে জবাব দিলে সে, ঠিক উল্টো। এমন নিজস্ব শ্রী যে জায়গায়, তার নাম কি শ্রীনগর ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে।

শ্রীনগর থেকে রুদ্রপ্রয়াগ। বাইশ মাইল রাস্তায় পথের শোভা অপূর্ব্ব। নিঃসীম নীলিমার বুক থেকে রাশি রাশি মেঘ যেন দূরে সবুজ পাহাড়ের কোল ঘিরে যে অরণ্যানী, তাকে স্পর্শ করেছে নীচে অলকানন্দার কলকল্লোল মুখরিত উপত্যকাকে সাক্ষী রেখে। উপলখণ্ডের গায়ে আছড়ে পড়া স্রোতের ধারার শুভ্রফেনার লক্ষ লক্ষ গতিতে ছুটে যাওয়া দেখতে দেখতে চলেছি। বাতাস বইছে হু হু করে, আর সে বাতাসে শাখায় শাখায় হিল্লোলিত হচ্ছে সবুজ বিটপী। পাতার বাহার আর বাহারে ফুলের আলপনা দিকে দিকে।

গাড়ীতে ঘণ্টি দিতে হয় না। 'জেনানা সীট ছোড় দেও' বলে কোন কণ্ডাকটর হাঁক পাড়ে না। অসতর্ক পথচারীকে বেশ আগে
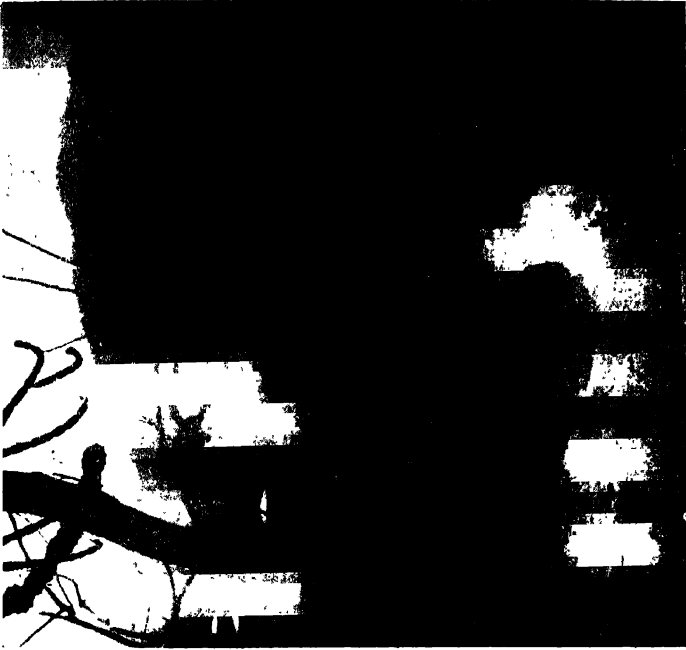
...গঙ্গা নামটার উৎপত্তি এখানে—পৃঃ ১১

...বাঁধানো সিঁড়ি সাততলা নীচে নেমে গেছে—পৃঃ ২০

...এইরকম চটি সারি সারি অনেকগুলি—পৃঃ ১৫

থেকেই সতর্ক করে হর্ণ তার নিজস্ব চীৎকারে। একটু আগে যিনি ভাল সীট না পাবার জন্যে ঝগড়া করছিলেন 'ম' বাবুর সঙ্গে, সেই গালিব একেবারে পরনির্ভর হয়ে উল্টে হুমড়ী খেয়ে 'ম' বাবুর হাঁটুর ওপর পড়লেন মুখ থুবড়ে। আমি সামলাচ্ছি মুক্তোদাদার স্ত্রী মুক্তি-বৌদিকে। জনি ওয়াকার (পায়ে হেঁটে না গিয়ে ঘোড়ায় চেপে যাবেন, এই কথা বরাবর বলছিলেন) কুলী বীরবাহাদুরকে আঁকড়ে ধরে বসে আছেন। রাস্তা ভাল নয়। যেমন ধুলো তেমনি খোয়া, যেমন বাঁক, তেমনি উঁচুনীচু। এবারেও দু-একজন বমি করলেন।

গুরুজী বললে, থীরু তুমি একটা গৎ ধরো।

থীরুর মাউথঅর্গান বেজে উঠল। গানের সুরের ছন্দ স্থানীয় লোকেদের যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দমেশানো মুখচ্ছবিতে যে ঢেউ তোলে, তার রেশ থাকে বহুক্ষণ, আমরা চলে যাবার পরেও।

বাসের লাফানি দেখে রোগা লম্বা পিংখাড়ু হেসে বললেন, এ যে বাবা, বসে বসেই হাইজাম্প।

জন গিলপিন ফেল্ট হ্যাট উঁচিয়ে বললেন, এমন জানলে আমি হৃষিকেশ থেকেই ঘোড়া করতুম।

মধ্যম পাণ্ডব বললে, চেপে যাও দাদা।

বাস এল রুদ্রপ্রয়াগে। আজকের মত যাত্রা শেষ। বিকেলের পড়ন্ত রোদে ভাল লাগছিলো জায়গাটা। বিস্তর দোকান পাট। অনেক লোকের আনাগোনা। কুলী, যাত্রী, ছড়িদার সকলের মধ্যেই কেমন যেন একটা ব্যস্ততার ভাব। ওদিকে বাসষ্টেশন থেকে অনবরত নাম ডেকে চলেছে যাত্রীর। এখানে বাসে সীট পেতে গেলে আগে ওদের অফিসে নাম রেজিষ্ট্রী করে আসতে হয়। তারপর ওরা পরপর নাম ডেকে জায়গার বন্দোবস্ত করে দেয়। 'ম' বাবুর সঙ্গে অন্য বন্দোবস্ত। আজ আমাদের এখানেই রাত্রিবাস।

অলকানন্দা ও মন্দাকিনীর সংগম এই রুদ্রপ্রয়াগ। বাসষ্টাণ্ড থেকে অলকার ওপর পুল পেরিয়ে যেতে হল পায়ে হেঁটে। ধর্মশালা

অনেকগুলি, তবে ভীড় সবগুলিতে। রাস্তার ওপর ছোট ছোট পাথর সাজিয়ে উনুন তৈরী করে, কাঠের আগুনে হাতে গড়া রুটি সেঁকে নিচ্ছে রাজস্থানী ও দক্ষিণভারতীয় মেয়ে পুরুষ। ধোঁয়ায় আর ধুলোয় সমাচ্ছন্ন অঞ্চলটি যাত্রীদের কলরব মুখরিত। ক্ষুৎপিপাসা আছে, তাই নিবৃত্তির এত চেষ্টা।

আমরা চারজন ধর্মশালার পাশেই একটা ছোট নতুন চটিতে আশ্রয় পেয়েছি। মধ্যমপাণ্ডব রইল তার মায়ের কাছে। ছোট ছোট জানালা দরজা দিয়ে অনন্ত অসীমের পানে দৃষ্টি রেখে রূপসুধা পান করি এ বসুন্ধরার। জানালা দিয়ে আর পৃথিবীর কতটা দেখা যায়! 'দে দোল দোল' বলে কুলুকুলু শব্দে বইছে অলকা। স্রোতের ঘূর্ণীতে ঢেউ উঠছে উত্তাল; দোল লাগাচ্ছে পাথরখণ্ডে, দোল লাগাচ্ছে যাত্রীর মনে, পথিকের হৃদয়ে, দর্শকের অন্তরে।

ওদিকে সবুজের সারির মাঝে মাঝে ছোট্ট ছোট্ট ঘর। কম্বলের জামা গায়ে গ্রাম্যবধূ ক্ষেতে কাজ করছে হয়ত, আর ফিরে ফিরে দেখছে সকৌতুকে সমতলের অধিবাসীকে। আজ নয়, রোজই দেখে সে অমন করে। দেখে তাদের পোষাকের বৈচিত্র্য, দেখে যাত্রাপথের যাত্রীদের উল্লাস-উদ্বেগ। ওদিকে রক্তিম সূর্য্যলেখাস্নাত পাহাড়ের সোনালীমায়া। বলে, 'আমি তোদের ডাক দিয়েছি আয়, আয়, আয়'।

সারাদিনের ক্লান্তিতে সে সন্ধ্যায় আর ঘোরাঘুরি হল না। প্রকৃতির নিয়মে সুপ্তি কখন এসে তুচোখের পাতা এক করে দিয়েছে, টেরই পায়নি। ঘুম ভাঙ্গল ছারপোকার কামড়ে। উঠে দেখি টর্চ জ্বালিয়ে ছারপোকা নিধনযজ্ঞ সুরু করেছে ইতিমধ্যে গুরুজী, থীরু ও চট্টি চ্যাটার্জী। ঘুমোয়নি কেউ। খাবার এসে গেল।

খাওয়াদাওয়া সেরে চটির সামনের বারান্দায় এসে বসলাম। ওরা এবার শুয়ে পড়েছে। আমি মোমবাতি জ্বেলে ডায়েরী নিয়ে বসলাম। চাদরটা গায়ে টেনে চাপা দিই। রাত্রির গভীরতায়, অলকানন্দার ঝরঝর শব্দে উদাস হয়ে যায় মন। কে আমি, কেন এসেছি এখানে,

লক্ষ্য কি, এসব প্রশ্নের উত্তর লিপিবদ্ধ করার কি প্রয়োজন ? তার চেয়েও যা দেখেছি, যা পেয়েছি, মনের পটে যে ছবি আঁকা হচ্ছে প্রতিনিয়ত, তারই বর্ণনা লিপিবদ্ধ করি। আবার ভাবি, গাইডবুক তো আছে, ভ্রমণ কাহিনীও আছে, তবে কেন নতুন করে লেখা। আবার ভাবি, নিত্য নতুন পথের সন্ধান কে দেবে আগামী যাত্রীদের। তারা যে পূর্ব্বসূরীদের দিকে চেয়ে বসে থাকবে। চিরন্তন এক পথিকের প্রাণের বাসনাকে ভাব থেকে রূপে প্রকাশ করবার সাধনা আমার। পারবো কি ? ভাবতে থাকি। মোমবাতিটা এক সময় দমকা হাওয়ায় নিভে যায়। শুয়ে পড়ি আমি চিন্তা-শিখাকে নিভিয়ে দিয়ে।

ভোর রাত থেকে যাত্রীর চলেছে সংগমস্নানে। প্রভাতের স্নিগ্ধ হাওয়ায় তন্দ্রার ঘোর কাটতে চায় না কিছুতেই। চোখ খুললেই চোখে পড়ে সবুজ গহন বনরাজীর শ্যামলিমা। রাস্তার ধারেই চটি। এলাহাবাদের পিসীমার গলা পাই। অনেক তীর্থ ঘুরেছেন, সারাপথ তার গল্প করতে করতে চলেন। বলেন, সেবার চলেছি দক্ষিণ ভারতে। মাদ্রাজে এক কাণ্ড ঘটল। আমাদের দলে ছিল একটা তিলি ছেলে। ছেলেটি ভাল, আমাদের খুব দেখাশুনা করত। হয়ত ট্রেণ থেমেছে কোথাও, দৌড়ে ছুটে গিয়ে জল নিয়ে এল। কোথায় কফি, কোথায় চা, ছুটে ছুটে নিয়ে আসে। মাদ্রাজে হোটেলে হঠাৎ বামুনমা বললে—ওর হাতে খাব না। সেজখুড়ী তাই শুনে বললে—ট্রেণে ওর হাতে জল খেলে আর এখন এখানে জাত বিচার। বামুনমা শুনে তো ক্ষেপে আগুন। শেষে আমরা মিটিয়ে নিলুম। বামুনমাকে বোঝান হল যে জাতে তিলি হলেও ও মানুষ, তাছাড়া ওর উপকার ভুললে চলবে কেন।

এমনি ধারা কত গল্প বলেন। আমি শুনে স্তব্ধ হয়ে যাই। ছেলেবেলায় ওয়ার্ডবুকে পড়েছি, গড্ ঈশ্বর, লর্ড ঈশ্বর, কাম্ মানে এস। ঈশ্বর বাস করেন মানুষের হৃদয়ে। কাছের মানুষকে তো 'এসো' বলে অভ্যর্থনা করে না মানুষ। আসলে মানুষ

মানুষকে ভালবাসতে ভুলে গেছে, নিতান্ত স্বার্থবোধে তীর্থপথের আত্মীয় পরক্ষণেই বর্ণবিদ্বেষে হয়ে যায় পর। জাত্যাভিমান-টাই বড়, মানুষটা হল ছোট। সংস্কারের ভিত গভীর বলেই বুঝি ওরা সংস্কারের গণ্ডী কাটিয়ে উঠতে পারে না। পারে না, না, চায় না গণ্ডী কাটিয়ে বেরিয়ে আসতে। কে জানে।

এগারটার সময় বাস ছাড়বে। আমরা স্নানের উদ্যোগ করি। ধর্মশালা থেকে একটু দূরেই সংগমের ঘাট। রাস্তার কাছ থেকেই বাঁধানো সিঁড়ি প্রায় সাততলা নীচে নেমে গেছে। নামতে নামতে দু'বার দম নিতে হল। ঘাটে দেখা অনেকের সঙ্গে।

কুমারডুবীর শ্রীকুমার বললেন, এরা একটা লিফটের ব্যবস্থা করতে পারে অনায়াসে। যাত্রীরা দান করতে প্রস্তুত।

শিলঙের মেজদা বললেন, লিফট্ তৈরী করার কণ্ট্রাক্টটা পেলে মন্দ হত না।

মুক্তোদাদা বললেন, লিফট্টা একেবারে স্বর্গ পর্য্যন্ত হলেই তো ভাল হয়।

হেসে ওঠে সবাই ওঁর কথায়।

দু'পাশ থেকে দুই নদী এসে মিশেছে যেখানে, সেটাই সংগম। কেদারনাথের দিক থেকে মন্দাকিনী, শান্ত, মধুর, কোমল; বদ্রীনাথের দিক থেকে অলকানন্দা, ভীষণা, ভীমগর্জনা, প্রবলশালিনী।

কাঠ ভেসে চলেছে নদীতে। ব্যবসায়ীর জন্যও অলকানন্দার কি আয়োজন! হেথায় পুণ্যস্থান, হোথায় কাঠের হিসেব।

ধীরু বললে, সংগমের ছবি তুলব ওপাশ থেকে।

মধ্যমপাণ্ডব বললে, তাই চলো, পুল পেরিয়ে ওপারে যাওয়া যাক।

গুরুজী বললে, ভালই তো, স্নানটা ওপাশে মন্দাকিনী তটে সেরে নেওয়া যাবে। কি বল, তানসেন?

আমি কিছু বলবার আগেই চট্টি [illegible], তানসেন আবার বলবে কি, চল সবাই।

' মাউথঅর্গান বাজিয়ে পঞ্চপাণ্ডব চলে। আবার সিঁড়ি ভাঙ্গা। সংগমে রুদ্রনাথের মন্দির। সিঁড়ির মাঝখান বরাবর দেবী মন্দির। শুনলাম, পরশুরামের অভিশাপে ব্রহ্মরাক্ষসে পরিণত বহু ব্রাহ্মণ এই পবিত্র সংগমের পূত সলিল স্পর্শে মুক্তিলাভ করেছিলেন। নাস্তিক যারা, তাদেরও থমকে দাঁড়াতে হয় এখানে। মুখ বাড়িয়ে দেখতে হয় কি আছে ভেতরে অনন্ত রহস্য। না দাঁড়িয়ে উপায় কি, সিঁড়ি ভাঙ্গতে হাঁফিয়ে উঠে দম নিতে হবে তো।

জুতো খুলে রেখেছিলাম মন্দিরের কাছটাতে এখানে। ফিরে এসে দেখি এক পাটি নেই। একজনকে জিজ্ঞাসা করতে, সে তো এই মারে কি এই মারে। লোকটি এখানকার পাণ্ডা, অতএব তাকে জুতোর কথা জিজ্ঞাসা করে আমি নাকি অপমান করেছি।

বললাম, আপনাকে পাণ্ডা বলে বুঝতে পারিনি, ক্ষমা করবেন।

তিনি কিন্তু ক্রমশঃ উত্তেজিত হচ্ছেন। বচসা শুনে থমকে দাঁড়ান অন্যান্য যাত্রী। পাণ্ডার ক্রোধ ক্রমে উগ্র হতে উগ্রতর হতে লাগল। রুদ্রপ্রয়াগে স্থানীয় পাণ্ডার রুদ্রমূর্ত্তি দেখে অনেকে বিস্মিত হলেন। আমি হইনি। কেননা আমি জানি এর ওষুধ। দক্ষিণার দাক্ষিণ্যে প্রশমিত করি তাকে।

ইতিমধ্যে খুঁজতে খুঁজতে হারানো একপাটি জুতো পাওয়া গেল। পায়ে পায়ে ঠোক্কর খেতে খেতে অনেকদূরে চলে গেছল।

গুরুজী বললে, দেখলে দক্ষিণার মাহাত্ম্য। একটু সমঝে চলো ভায়া।

থীরু বললে, না দেওয়াই উচিৎ ছিল।

আবার সবাই সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে উঠতে সুরু করি।

কয়েক বছর আগেও এখান থেকে হাঁটতে হত যাত্রীদের। এবারে বাস এগিয়ে গেছে অনেকটা। রুদ্রপ্রয়াগ থেকে কাঁকড়াগড়। এগারটা নাগাদ বাস ছাড়ল। 'ম' বাবু আগেই বাস রিসার্ভ করেছেন।

আমাদের রিসার্ভ করা বাসে এক সাধুকে বসে থাকতে দেখে কেউ

কেউ তাকে নেমে যেতে বলে। গলায় উপবীত, পরণে কৌপীন সেই সাধু কোন কথা না বলে ঝোলা থেকে একটি ভাঙ্গা শ্লেট বের করে তাতে ভুল হিন্দীতে লিখলেন, 'ভাড়া দিয়েগা'। তাকে বোঝান গেল না, এটি রিসার্ভ করা বাস। শেষে কণ্ডাকটর এসে বলতে তিনি নেমে গেলেন। আমি অবাক বিস্ময়ে দেখলাম প্রশান্ত হাসি হেসে ছোট্ট একটি পুঁটলী নিয়ে মৌনীবাবা নেমে এলেন বাস থেকে কোন বিরক্তি প্রকাশ না করে।

একবার মনে হল, হলই বা রিসার্ভ করা বাস, কি এমন ক্ষতি হত তাকে সঙ্গে নিলে। মুখ ফুটে সে কথা বলতে পারলাম না। কেন পারিনি, ভয়ে, না লজ্জায়, না সঙ্কোচে, না কি সৎসাহসের অভাবে—জানিনা, তবে স্বীকার করছি যে বলতে পারিনি।

বাস চলল, ছতৌলী, অগস্ত্যমুনির মন্দির পেরিয়ে। অনেক যাত্রী বাসে সীট না পেয়ে পায়ে হাঁটতে সুরু করেছেন রুদ্রপ্রয়াগ থেকেই। প্রচণ্ড রোদ। ঘামে আর ধুলোয় গা চটচট করছে। আমরা চলেছি নাগরদোলায় দুলতে দুলতে। কলকাতায় বাসে গায়ে গা ঠেকলে যারা সহযাত্রীকে ট্যাক্সি চেপে যাওয়ার সদুপদেশ দেন, তারাই হাত বাড়িয়ে সহযাত্রীদের উল্টে পড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করছেন। হ্যারিকেনের চিমনী ক্যাশবাক্সের গুঁতো খেয়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। সাইক্লোনে জাহাজ যখন দোলে সাগরের বুকে, তখন যাত্রীদের অবস্থা কেমন হয় অনুমান করি খানিকটা।

বাসের খোলে গড়াগড়ি খেতে খেতে হাসির ফোয়ারা ওঠে। এক জায়গায় একটা বাস অকেজো হয়ে পড়ে আছে পথের পাশে। দুরন্ত ছেলে যেন হাত পা মচকে বসে আছে। তাকে সাবধানে পার হতে হল। ধীরু যতবার চেষ্টা করছে মাউথঅর্গান বাজাবার, ততবারই বিফল হচ্ছে বাসের দুলুনীতে। নতুন রাস্তা উঁচু-নীচু, অথচ আশ্চর্য্য এই পাহাড়ী ড্রাইভারদের দক্ষতা। নির্লিপ্ত হয়ে সমানে গাড়ী চালাচ্ছে।

বঙ্কুদা বললেন, সব রস যে শুকিয়ে গেল বাবা।

রসগোল্লাদা বললেন, ভাবনার কিছু নেই। আমার কাছে আছে রসগোল্লার টিন। রসগোল্লা ফুরিয়ে যাবে পথে, রসের টিন যাবে সঙ্গে।

বাস থামল একটা গেটে। অন্যদিকের বাস এসে পড়েনি তখনও। জনকয়েক নেমে গেল কোমর ছাড়িয়ে নেবার জন্যে। মিঃ দে দেখি একমনে ব্রিদিং একসারসাইজ করতে লেগে গেলেন। একটি অন্ধ ছেলে ক্রমাগত একসুরে 'ম্যয় সুরদাস হুঁ' বলে ভিক্ষে করে চলেছে। তার হাতের সংগৃহীত মুদ্রাগুলি দেখলাম সবই এক নতুন পয়সা। হায়রে দেশ! কয়েকশত টাকা খরচা করে চলেছি ভ্রমণ করতে, অথচ গরীব এই ছেলেটিকে দেবার বেলায় কৃপণ হাতে একটি নতুন পয়সার বেশী ওঠে না।

কাঁকড়াগড়ে এসে বাস থামল। এখানে কোন চটি তৈরী হয়নি আজও। বাস চলার উপযোগী রাস্তা তৈরীর কাজ চলেছে পুরোদমে। কর্মরত মজুরের দল আনন্দে দেখে আমাদের দিকে চেয়ে। চোখের নীরব ভাষা যেন অভ্যর্থনা জানায় বিদেশী অতিথিকে। কাল যে পথ নির্মিত হল তাদের কঠোর পরিশ্রমে, আজ সে পথে ভিন্নদেশের অধিবাসী আসে বাসে চেপে। ওদের নিত্যকর্মের মাধ্যমে ওরাই যে রচনা করছে যুগ যুগ ধরে পরস্পরকে চেনাজানার সেতু, সে ওরা জানেনা।

কাঁকড়াগড় থেকে সুরু হল হাঁটা। আশা আছে, আনন্দও আছে। দুর্গমের পথে পা বাড়িয়ে দুর্গমকে সুগম করতে পারার আনন্দ মনে নতুন আশার আলো জ্বালিয়ে দিয়ে যায়। আছে ভয়, আছে উদ্বেগ। কোনমতে যদি পা পিছলে যায়, তবে চিরদিনের মত হারিয়ে যাবার ভয়মিশ্রিত উদ্বেগ মনের কোণে চকিতে উঁকি মারে।

গুরুজী থেকে থেকে হাঁক মারে, 'চল বেটা'।

এ রাস্তায় পায়ে হেঁটে এই প্রথম একটি ঝুলা পার হওয়ার আনন্দ পেলাম একটু হেঁটেই। দড়ি দিয়ে দুদিকে টান করে বেঁধে রাখা এই ঝুলা কত যাত্রীকে পারাপার করে দিচ্ছে নিয়ত, কে হিসাব রাখে। মন্দাকিনী এবার পড়ল ডানদিকে।

ক্ষিদেয় পেট জ্বলছে সবার। ক্ষুধা মানুষকে অন্ধ করে। প্রকৃতির শোভা, পরিজনের দুঃখ, এসব তখন অবাস্তব মনে হয়।

নীলগেঞ্জী বললেন, আর কতদূর মশাই ?

'ম' বাবু বললেন, গিয়েই গরম ভাত। লোক পৌছে গেছে আমার এতক্ষণে।

সবাই হাঁটছে। বৈচিত্র্যহীন একটানা খাটুনী আর নিত্য অভাব-পীড়িত সংসারের চিন্তা মানুষকে ভুলিয়ে দেয় যে তার কর্মজীবনের বাইরেও একটা জীবন আছে, একটা জগৎ আছে। সে জগতে যত বা বিচিত্রতার স্বাদ মেলে, ততই আনন্দানুভূতিতে ভরে ওঠে মন। 'কি পাইনি তার হিসাব মিলাতে' মন চায়না কারও। উৎসাহ আর উদ্যমের বন্যা এসে দ্বিধা আর হতাশার আগাছাকে সমূলে উৎপাটিত করে। এ জগৎ সুন্দরের জগৎ। হাঁটতে হাঁটতে সবাই এগিয়ে চলি আমরা।

'ম' বাবুর ব্যবস্থাপনায় আমাদের হাঁটা ছাড়া আর কিছু করবার নেই। হ্যাণ্ডব্যাগটা কুলীর মাথায় দেওয়া যাবে কি না ভাবছি, একটি কিশোর এসে ওটা বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে মিনতি করতে লাগল। 'এ বাবু কুলি লিজিয়ে' বলে এমনভাবে পীড়াপীড়ি করতে লাগল যে চট্টি চ্যাটার্জ্জী আর আমি তাকে দিয়ে দিলাম দু'টি ব্যাগ। খুশী হল সে। দেখতে দেখতে পার হয়ে এলাম দু'মাইল পথ। মিলল আমাদের হাঁটা পথের প্রথম চটি, কুণ্ডচটি।

হয় চটি, না হয় ধর্মশালা; যাত্রীনিবাস অথবা পাণ্ডার বাড়ীও আছে মাঝে মাঝে। সারাপথে এই হচ্ছে বিশ্রামগৃহ। একটু বিশ্রাম নিয়ে ক্লান্তি শেষে সামনের রাস্তার দিকে চোখ পড়লেই ফুরিয়ে যায়

চটির প্রয়োজন। তবু চটিতে বসি, বিছানা পাতি, মেঝেয় আরাম করে হাত পা খেলিয়ে শুই।

পাথর আর মাটি, এই নিয়ে চটি। চটির মাঝখানে সিঁড়ি। দোতলায় ছুপাশে টানা বারান্দা। বারান্দার পেছনে একটি ছুটি ঘর। বারান্দার একপাশে সারি দেওয়া উন্নুন। পরিস্কার করে নিকিয়ে রাখা মেঝেয় কিছু না পেতেও শোওয়া যায়। এই রকম চটি সারি সারি অনেকগুলি। যাত্রী চটি ছেড়ে চলে গেলেই ঝাঁট দিয়ে মুছে পরিস্কার করে রাখে চট্টি চৌধুরী। পরে দেখেছি চট্টি চৌধুরী লোকগুলি ভাল।

আমরা যেখানে আশ্রয় নিয়েছি, তারই নীচের তলায় রান্না হচ্ছে। কাঠের আগুনের প্রচণ্ড ধোঁয়ায় ওপরে বসে থাকা কষ্টকর। পঞ্চপাণ্ডব নীচে নেমে চলি।

অদূরেই নদী। চটির প্রায় এক ফার্লং দূরে চট দিয়ে ঘেরা সারি সারি ছোট খুপরী। প্রথমে রাস্তার ওপরেই গেট। সেখান থেকে ছুপাশে চুনকাম করা পাথর বসানো পথ ও পথের শেষে চট দিয়ে ঘেরা খুপরী। খুপরীগুলি সাদা রং করা ও নীচের দিকে আলকাতরা মাখানো। একটি সারির গায়ে পুরুষ মানুষের ছবি আঁকা, অপর সারির গায়ে মেয়েমানুষের ছবি। সুন্দর ব্যবস্থা পায়খানার।

'ম' বাবু লোক গুণছেন। জাহাঙ্গীর ও নূরজাহান তখনও এসে পড়েন নি। সুরু হয়েছে কোলাহল। 'ওরে ও বেডিংটা আমার', 'এই কুলী, তোরঙ্গটা এদিকে লে আও', 'দিলে ভেঙ্গে আমার আচারের শিশিটা,' 'আমার বিছানা ওদিকে রাখলি কেন, চোখে দেখতা নেই,' যে যার মালপত্তর সামলাতে ব্যস্ত।

'চোখে দেখতা নেই' বলে কুলীকে তিরস্কার করে আর কি হবে। আমরাই কি সব সময় সব জিনিষ দেখতে পাই, না দেখবার চেষ্টা করি। ঠাকুর বলতেন, 'পেঁয়াজের খোসার মত আমিত্বের খোসা ছাড়াতে

ছাড়াতে দেখবি আমি বলে কিছু নেই'। কিন্তু তবু আমরা 'আমি, আমার' এই নিয়েই আছি। সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে আমরা আর ক'জন জীবনের পথে চলাফেরা করতে পারি।

মধ্যমপাণ্ডব রান্নাঘরের দিকে গেল, কতদূর হয়েছে দেখতে। খানিক পরে আমরা স্নানাদি সেরে খেতে বসি সবাই। গরমভাত, ঘি, ডাল, ভাজা, ডালনা, চাটনী। অমৃতেও যদি কারও অরুচি হয়ে থাকে, এমন খাদ্য পেলে তিনিও খুশী হবেন।

মধ্যমপাণ্ডবকে উদ্দেশ্য করে গুরুজী বললে, একটু খালি রেখো ভায়া। আজ থেকে অনবরত হেঁটে যেতে হবে। রিয়্যাকসনটা দেখে এ্যাডজাষ্ট করো।

মধ্যমপাণ্ডব বললে, অমন শরীর আমার নয়। খাওয়ার সময় খাওয়া, হাঁটার সময় হাঁটা, ঘুম পেলে ঘুম।

বাগনানের দিদিমা বললেন, এই তো জোয়ান ছেলের মত কথা।

বঙ্কুদা বললেন, আমারও তাই মত।

চাপাস্বরে কে যেন বললে, চেপে যাও বঙ্কুদা।

চাপা হাসির ঢেউ ওঠে খাবার আসরে।

এইখান থেকেই ডাণ্ডী, কাণ্ডী, ঘোড়ার ব্যবস্থা করা হল। 'ম' বাবু শরীর সামর্থ্য বুঝে যার যেটি, তার তেমনটি ব্যবস্থা করলেন। হঠাৎ দেখি আমাদের রসগোল্লাদা বেজায় হাসতে সুরু করেছেন।

কি হল মশাই, অত হাসি কেন—জিজ্ঞাসা করি আমি।

ঘরের বৌ, ঝিকে ঘোড়ায় চাপতে দেখে হাসি পাচ্ছে। দেখুন, দেখুন, কি ভাবে বসেছেন—বলে হাসতে থাকেন।

চট্টি চ্যাটার্জী বললে, আপনি যে ভাবে হাসছেন, শেষ পর্য্যন্ত আপনার ব্যালান্স ঠিক থাকলে হয়।

নীলগেঞ্জী বললেন, সে কি, রসগোল্লাগুলো কি হবে তাহলে?

বাঁরু বললে, কেন আমরা আছি কি করতে।

কিছু হবে না মশাই। আমার হাসি পেলে আমি চাপতে পারি না—বলে হা হা করে হাসিতে ফেটে পড়েন রসগোল্লাদা।

কুলী এজেন্সীর লোক মালপত্তর ওজন করা সুরু করে দিলে। কার কত ওজন লিখে রাখা হল, ওজন হিসেবে পয়সা। মালের ওজন কম লেখাবার জন্যে দেখি অনেকেই বাক্স পেঁটরা খুলে গরম জামা কাপড় বার করে নিচ্ছেন। ডাণ্ডী, কাণ্ডী যাদের আছে, তারা সেগুলি তাতে চাপিয়ে দিলেন। যারা ঘোড়ায় চেপে যাবেন, তারা ঘোড়াওলার হাতে পুঁটলীটা দিয়ে দিলেন। হাঁটা পথের যাত্রীরা ওদের দেখাদেখি জামাকাপড় বার করে মুস্কিলে পড়লেন। বোঝা নিয়ে চলবে কে? উৎরাই পথে নিজেকেই বোঝা বলে মনে হয়।

জনপ্রতি যেখানে আধমণ করে বোঝা সঙ্গে নিতে হয়, সেখানে দু এক পাউণ্ড গরম জামাকাপড় কমিয়ে কার যে কি অর্থের সুরাহা হল জানিনা, কিন্তু দরিদ্র কুলীর ভাগ থেকে কিছু কমে গেল দেখে দুঃখিত হলাম। ব্যথিত হলাম এই ভেবে যে অর্থব্যয়ের সমগ্র পরিমাণ যেখানে কয়েকশত টাকা, সেখানে ব্যয়ের অঙ্ক সঙ্কোচের চেষ্টা করছে সেই মানুষ, যে বেরিয়েছে হিসেব নিকেশের জগৎ ছেড়ে।

গালিবকে বলতে শুনলাম, খানিকটা চলো, তারপর গুপ্তকাশীতে গিয়ে আবার হোল্ডলে পুরে দেওয়া যাবে।

সঙ্কীর্ণ মন নিয়ে অনেকে মুচকে হেসে সমর্থন করলেন ওকে।

আর একটা পার্টির মাল ওজন হচ্ছে ওপাশে। ওজন করবার সময় কায়দা করে বেশী ওজন লিখিয়ে নিচ্ছিল কয়েকটি কুলী। এখানেও হাত সাফাই। ওদের দলের লীডার সেটা ধরতে পেরে কুলী এজেন্সীর সর্দ্দারকে দুকথা শুনিয়ে দিলেন।

গুরুজী দেখে শুনে বললে, লিখে রাখো তানসেন।

বললাম, নিশ্চয়ই। দুয়ে পক্ষ। দু পক্ষের কথাই লিখে রাখব।

আমাদের কুলীদের চিনে রাখলাম আমরা। পঞ্চপাণ্ডবের

জিনিষপত্র নিলে জংবাহাদুর। তার ছোট ভাই আমাদের কিছু জিনিষের সঙ্গে আর একজনের জিনিষ নিলে।

বেলা বাড়ছে। আবার সুরু হল পথ চলা। গুপ্তকাশী পর্য্যন্ত পথ চড়াই। দু পা করে এগিয়ে চলেছি আর তৃষ্ণায় শুষ্ককণ্ঠ হয়ে জলের বোতলের মুখ খুলেছি বারবার। হাঁফ ধরে যায় খানিকটা চলবার পর। পাশ দিয়ে ক্ষিপ্রগতিতে চলে যায় ডাণ্ডীওলারা 'শেঠ বাঁচো' শব্দ করতে করতে। ওদের পা ফেলার ছন্দে গতি হয় দ্রুত। মনে হয় কাঁধের ভার গতিকে করে ছন্দায়িত, ছন্দ করে গতিকে দ্রুত।

একটু বিশ্রামই যথেষ্ট। আবার চলতে সুরু করি। সঙ্গে আছে গুরুজী। আমাদের যারা পেছনে ফেলে গেছল, এবারে তাদের আমরা পেছনে ফেলে আসি। পথের পাশে ডাণ্ডী নামিয়ে বিশ্রাম নেয় ডাণ্ডীবাহক।

দূরের পাহাড় কাছে এগিয়ে আসে। আকাশে মেঘ নেই। অনেক যাত্রী আগে ও পরে। কেবল হাঁটা আর নিজের বেদনা ভুলে অপরকে উৎসাহ দেওয়া। বেশ আনন্দ লাগে। সকলেই চলেছে এগিয়ে, হৃদয়ে অদম্য সংকল্প নিয়ে। তাদের চোখে মুখে যেন ফুটে উঠেছে ভাগবত তন্ময়তা।

এলাহাবাদের পিসিমা বললেন, হ্যাঁ বাবা, তোমাদের হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে না।

জবাব দিই, না, না, কষ্ট কি। এই তো বেশ হাঁটতে হাঁটতে চলেছি। হেঁটে গেলে বেশ দেখতে দেখতে যাওয়া যায়।

হায়, আমরাও যদি তোমাদের মত হাঁটতে পারতুম। তোমরাই এ যাত্রায় বেশী লাভ করেছ।

ও কথা কেন বলছেন। আপনি এই বয়সে যা করছেন, আমরা কি আর সে বয়স পর্যন্ত পৌছুতে পারব।

বালাই ষাট্, অমন কথা বলতে নেই—এলাহাবাদের পিসীমা এগিয়ে যান।

বোলপুরের শান্তিদিদি বললেন, দেখলে ভাই, ঠাকুরপোর কাণ্ড। আমাকে ডাণ্ডীতে চাপিয়ে দিয়ে নিজে চলল হেঁটে।

চলুক না। হাঁটিতে না পারলে ঘোড়া করে নেবে, বললে গুরুজী।

আশ্বস্ত হলেন তিনি।

পাহাড়ী একটি দম্পতী কোথা থেকে যেন আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। অবাক হয়ে যাই, এরা এল কোথা থেকে। একটি ফুটফুটে বাচ্চা মেয়ে রয়েছে ওদের সঙ্গে। সলজ্জ মেয়েটি এগিয়ে আসে। সকৌতুকে বলে, শেঠ, তাগাস্থই দেও, পাই পয়সা দেও, এ শেঠ।

ঝাঁ করে তাকে দুহাতে কোলে তুলে নিয়ে একপাক ঘুরে নেচে নিই আমি। মেয়েটি খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে।

গুরুজী বললে, আহা তানসেন, করছ কি, পড়ে যাবে যে!

পড়ে যাবে? দেখছ না কি রকম হাসছে। একটী পাই পয়সা পেলে কি এত হাসি হাসতে পারত।

তা হয়ত হাসত না, কিন্তু ওর বাপ মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছ?

কেন, ওরাও তো হাসছে। ওরাও তো খুশী।

খুশীর আড়ালে ঢাকা দৈন্যের চেহারাটা দেখতে পাচ্ছ না?

দেখতে চাই না। ওদের মুখে যেন সারারাস্তা এমনি হাসি ফুটিয়ে তুলতে পারি।

তা তুমি পারবে, তা ব'লে ওদের অভাবকে এমনি করে উপেক্ষা করবে? ওরা যে প্রত্যাশা করে অনেক কিছুই।

প্রত্যাশা যা করে. তা তো পাবেই, এটা তো বাড়তি পাওনা— এই বলে একটি একটাকার নোট এগিয়ে দিই বাচ্চা মেয়েটির দিকে। হতভম্ব হয়ে আমাদের কথা শুনছিল পাহাড়ী দম্পতী; ছোঁ মেরে মেয়ের হাত থেকে টাকা তুলে নেয় বৌটি। গাড়োয়ালী ভাষায় কী আশীর্ব্বাদ করল বুঝতে পারিনি, তবে ওদের চোখের চাউনীর কৃতজ্ঞতার ভাষা বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলাম।

গুরুজী পিঠ চাপড়ে বললে, সাবাস বেটা।

এগিয়ে চলি আবার। নীচে মন্দাকিনী, একপাশে পাহাড়। নাম না জানা লক্ষ লক্ষ গাছে, কোটি কোটি পাতার বাহার। দূরে বরফে ঢাকা চূড়ো দেখা যাচ্ছে একটি দুটি করে। থীরু আর চট্টি-চ্যাটার্জ্জী এগিয়ে এসেছিল বড় বড় পা ফেলে। যেখানটায় বসে বিশ্রাম নিচ্ছিল, সেখান থেকে আমাদের দেখতে পেয়ে মাউথঅর্গান বাজায় থীরু।

বৌরাণী ঘোড়ায় চেপে পাশ দিয়ে যেতে যেতে বললেন, পথের শেষ কোথায়।

মধ্যম পাণ্ডব বললে, এই তো এসে গেছি। আপনার চৈতক এত শ্লো কেন ?

সওয়ারীকে চিনছে—জবাব দিয়ে বৌরাণী এগিয়ে চলেন।

আরও অনেকে বসেছিল সেখানে। নীলগেঞ্জী, কুমারডুবীর শ্রীকুমার, বি. বি. সি (বাপের বড় ছেলে), ডাক্তার, বঙ্কুদা। জাহাঙ্গীর এবং নূরজাহান এসে পড়লেন।

থীরু বললে, তাড়াতাড়ি চলার কোন মানে হয় না। অথচ বেশী আস্তে হাঁটলে দলছাড়া হয়ে যাবো।

গুরুজী বললে, একটা মিডিয়ম স্পীডে চলাই বিধেয়।

বি. বি. সি বললেন, আমি চেষ্টা করব তানসেনের সঙ্গে সঙ্গে থাকতে।

কেন, ডাক্তারবাবুতো রয়েছেন। কিছু লোক ওঁর সঙ্গেও থাকবেন—বললেন নীলগেঞ্জী।

বঙ্কুদা বললেন, আমার মতে—

ওঁর কথা শেষ হবার আগেই আমি উঠে পড়ি।

ঠাকুরপো বললেন, আরে তানসেন চলল যে—বলে নিজেও উঠে পড়লেন।

একে একে সবাই উঠে দাঁড়াল। আবার চলল পঞ্চপাণ্ডব গুরুজীকে সামনে রেখে। বঙ্কুদা নিজেই চেপে গেলেন।

খানিকটা হাঁটবার পর গুপ্তকাশীর চটি দেখা গেল দূর থেকে। পেছনে তাকিয়ে দেখি রসগোল্লাদা আসছেন আস্তে আস্তে। অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। এক একসময় কাষ্ঠহাসির অভ্যর্থনা বা অভিবাদন ছাড়া কিছু করবার নেই। ওরাও আমাদের দেখছে, আমরাও ওদের দেখছি। পাথর আর কাঁকরবিছানো পথে ঠোকর খেতে খেতে এগিয়ে চলি। অনভ্যাসের পদক্ষেপে চোট লাগে পায়ে, তাই সাবধানে চলতে হয় সকলকে।

সূর্য্য হেলে পড়েছে। সূর্য্যের লালরং পাহাড়ের চূড়োয় চূড়োয় ছড়িয়ে পড়ছে। বরফের রক্তিমাভা সবুজের কোলে এক মনোরম বর্ণমালা সৃষ্টি করছে। সন্ধ্যে হতে অনেক দেরী। সন্ধ্যের মধ্যে পৌঁছুতে হবে গুপ্তকাশী।

পা যেন আর চলছে না। তবু মুখ ফুটে বলতে পারছি না সে কথা। মনে মনে ভাবছি প্রথম চড়াইটুকু পার হতে যখন এই অবস্থা, না জানি এমন কত চড়াই কি ভাবে পার হব। ভেবে লাভ নেই। অবিশ্রান্ত কলস্বরে মন্দাকিনী যেন জানিয়ে যায়, আয় রে আয়, লগন ব'য়ে যায়।

সন্ধ্যে নাগাদ পৌঁছে গেলাম গুপ্তকাশী। জনবহুল জায়গা। পোষ্টাফিস, অনেকগুলি চটি, দোকান। একটা দোতলা চটির নীচের তলায় আশ্রয় মিলল আমাদের।

থীরু বললে, শবাসন জানো তো, একেবারে মড়ার মত স্থির হয়ে শুয়ে থাকো সবাই।

কোন কথা না বলে আমাদের তথাকরণ।

ভরা দুপুরে ভরা পেটে খাড়া চড়াই পার হওয়া যে কি ব্যাপার, আজ পাখার নীচে বসে লিখতে লিখতে সে কথাটা মনে হচ্ছে। মনে ছিল আশা, দেহে ছিল বল। অজানাকে জানবার, অচেনাকে চেনবার এক দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা দেহে সঞ্চার করেছে অমিত বলের, নব উদ্যমের, মনে আশা জাগিয়েছে অপার আনন্দের। তাই

সেদিনকার কষ্ট, কষ্ট বলে মনে হয়নি। দুর্গমের পথে যাত্রী আমরা এগিয়ে গেছি ধীরে ধীরে। সাপুড়িয়ার বাঁশী শুনতে যেমন এগিয়ে আসে অহিকুল, তেমনি সেদিন আমরা এগিয়ে গেছি অসীমের আহ্বান-গীতি শুনে।

কতক্ষণ শুয়েছিলাম জানিনা। সচকিত হলাম শিলঙের মেজদার ডাকে।

বললেন, চলুন, মন্দিরে দেবদর্শন করে আসি।

ধীরুর টর্চের বাতিতে পথ চিনতে চিনতে তার পেছু নিয়ে এগিয়ে চলি কয়েকজন।

চন্দ্রশেখর মহাদেবের প্রাচীন মন্দির।

সারা ভারতে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য মন্দির। মন্দিরের গাম্ভীর্য্যপূর্ণ পরিবেশের সঙ্গে মনকে খাপ খাওয়ানো যায় কি না ভাবছি। কিন্তু চেষ্টা করা বৃথা। সাময়িক স্থিতি, তাও চাঞ্চল্যময়। পাণ্ডার ভেট চড়াবার অনুরোধ, ঘণ্টাবাদন আর পূজারীর মন্ত্রোচ্চারণ, সব মিলিয়ে সেই এক ট্রাডিশন সমানে চলেছে আজও। ঘুরে ঘুরে দেখি। কুণ্ডের দুইমুখে দুইধারা। একটি গঙ্গার আর একটি যমুনার। গুপ্তকাশীতে গুপ্তদান করার রীতি আছে। অনুষ্ঠানটি উপভোগের।

আমাদের ঘরের সামনেই দালানে একদল পাঞ্জাবী। স্ত্রী পুরুষে মিলে প্রায় জন পাঁচেক। ফিরে এসে বিশ্রামের ফাঁকে ফাঁকে আলাপ জমাই ওদের সঙ্গে। বৃদ্ধ পিতা ও বৃদ্ধা মাতাকে নিয়ে চলেছে যুবক হরি সিং। সঙ্গের মহিলা দুজন ওদের প্রতিবেশী।

আমরা এ বয়সে কেন এ পথে এসেছি জিজ্ঞাসা করাতে, ধীরু হরি সিং-এর বাবাকে বললে, এ মহাপথের আহ্বান যে শুনেছে তাকে যে আসতেই হবে। বয়সের গণ্ডী দিয়ে কি ভক্তি বিচার হবে। মঙ্গলের পথে সবার সমান অধিকার।

হরি সিং-এর মা বললেন, বুড়ো-বুড়ীদের অগ্রাধিকার, একথা বলছি না। তবে বয়সের ধর্মও তো আছে।

হরি সিং বললে নিশ্চয়ই। তোমাদের জন্যই তো আমাকে আসতে হল। আমার ফুটবল কম্পিটিশনে নামা হল না।

বয়সের ধর্ম আছে ঠিকই, কিন্তু ধর্মের বয়স নেই, বললে গুরুজী।

ঠিক ঠিক। তোমরা লেখাপড়াজানা আদমী, তোমাদের চিন্তাধারাই আলাদা।

ওদের প্রতিবেশী মহিলার কথায় ছেদ পড়ল মুক্তিবৌদির আগমনে। বললেন, ভায়ারা এখানে বসে। ওদিকে বৌরাণী যে কীর্ত্তনের আসর জমিয়েছেন, চলুন চলুন।

ডাক এলে পঞ্চপাণ্ডব আর বসে থাকে না। গিয়ে দেখি বৌরাণীকে ঘিরে বেশ জনকয়েক বসে। বাউলের নৃত্যভঙ্গীসহ উদাত্তকণ্ঠের যে গান মাঠে মাঠে শুনতে ভাল লাগে, রেডিওতে সে গান শুনে আমার অন্তত সবসময়ে আনন্দ হয় না। সেদিন গুপ্তকাশীর চটিতে দূরদূরান্ত থেকে আগত যাত্রীদের কণ্ঠনিঃসৃত সুর বেসুরো হয়েও এক হয়ে গেছল নামগানের মাহাত্ম্যে। বাদ্যযন্ত্র ছিল না, ছিল না গানের অনুশীলন ; তাই অসঙ্কোচে মিলিয়ে দিতে পেরেছিলাম বৌরাণীর সঙ্গে নিজেদের কণ্ঠ। সুর ছিল এলোমেলো, আবেগটাই ছিল বড়। সে সন্ধ্যায় অন্যান্য যাত্রীদের প্রীতি উৎপাদন করতে পারার আনন্দে মনটা ভরপুর হয়েছিল।

রাত্রে খাবার আসরে মুক্তোদাদাকে জিজ্ঞাসা করলে থীরু, দাদা কি দান করলেন ?

বলতে নেই। তবে তোমরা যদি বল, তাহলে বলতে পারি।

সবার মুখে একই কথা। কেউই আর প্রথমে বলতে চায় না।

গুরুজী বললে, আমি আমার গুপ্তধন দান করেছি।

রাঙাদি হাসতে হাসতে বললেন, যা বলতে নেই, তা জানবার জন্যে বা জানাবার জন্যে এত আগ্রহ কেন।

জন গিলপিন বললেন, ঠিক বলেছ, মা।

নীলগেঞ্জী বললেন, কারও কিছু বলবার দরকার নেই, পাণ্ডাকে

টিপস্ দিলেই সব ধরা পড়ে যাবে। তার চেয়েও এখন যা চলছে, তাই চলুক। কই হে, আর একটু ডাল দাও। চচ্চড়ীটা বেশ হয়েছে।

গুরুজী বললে, আস্তে বলুন। 'ম' বাবু আবার কোথা থেকে শুনে ফেলবেন। সামনাসামনি ভাল বলা ঠিক নয়।

বঙ্কুদা কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, মধ্যমপাণ্ডব বললে, চেপে যাও বঙ্কুদা।

বিষম লাগল কারও কারও হাসতে গিয়ে।

শীতের প্রকোপ ক্রমশ বাড়ছে। ঠাণ্ডা জল পান করতে কষ্ট হয়।

গুরুজী আমার শীতালুতার কথা জানে। চুপি চুপি বললে, কম্বলটা টেনে নাও।

পাঞ্জাবী দলটি ঘুমিয়ে পড়েছে সবাই।

ধীরু বললে, তানসেন, আজ আর ডায়েরী লিখলে না?

না। এখন আর বাতি জ্বেলে কাউকে বিরক্ত করা ঠিক হবে না—বলে পাশ ফিরে শুই।

•

ভোররাত্রে জংবাহাদুর এসে ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিল। ভোরে বার হওয়ার যুক্তিসংগত কারণ আছে। শীতের ভোরে (এখানে মে মাসেও শীত) হাঁটতে ভালই লাগে। একদমে অনেকটা হাঁটা যায়, রোদ তেতে ওঠবার আগেই চটিতে পৌঁছে খাওয়াদাওয়া সেরে বিশ্রামের সময় পাওয়া যায়। এই জন্যেই বোধহয় পথের পাশে পাথরে স্বাস্থ্যবিভাগের হিন্দীতে নির্দেশনামা—সূর্য্যোদয়ের আগেই যাত্রা করা বিধেয়। নির্দ্দেশনামা আরও আছে। কয়েকটি ছড়ার মত।

ঘর বদন বস্ত্রকী কর সাফাই, যদি চাহ তুম দেশ ভালাই,
বাসী ভোজন গন্ধা পানী, বেমারীকী এহি নিশানী,
মাদক চীজ কভু না পীনা, যদি চাহ তুম অধিক জীনা,

এমনি আরও কত সাবধান বাণী।

আকাশ মেঘলা করে রয়েছে। ছায়াঘেরা অরণ্য চোখে আনে

স্বপ্নের মায়া। একটু থমকে দাঁড়াতে হয় মেঘলা আকাশ দেখে। চেয়ে চেয়ে দেখবার সে অবকাশ কই! রবারক্লথ দিয়ে বেডিংটিকে বাঁধা হল, যাতে বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পায়।

গুরুজীর 'চল বেটা' ডাক আর থীরুর মাউথঅর্গানে 'চলরে চলরে চল' সুর আমাদের পথে নামাল। সারিবন্দী হয়ে চলেছে সবাই।

বোষ্টমাসী সারারাস্তা গুণগুণ করে কৃষ্ণনাম ভাঁজতে ভাঁজতে চলেছেন। মাঝে মাঝে আমি যোগ দিই তাতে। গালিব, জন গিলপিন, জনি ওয়াকার চার্লিচ্যাপলিন, ঘোড়ায় চেপে চলেছেন। মুক্তোদাদা, মুক্তিবৌদি হেঁটেই এগিয়ে গেছেন অনেকটা। এলাহাবাদের পিসীমা, সিলিক ঠাকুরমা, বাগনানের দিদিমা, শিবপুরের মামীমা এরা সব ডাণ্ডী চেপে চলেছেন। দিদিমণি, বৌরাণী, রাঙাদির ঘোড়ার সঙ্গে চলেছে বোষ্টমাসী আর নন্দগোপাল বাবুর মায়ের কাণ্ডী। জাহাঙ্গীর ও নূরজাহান রয়েছেন পিছনে। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ডাক্তারবাবু, নীলগেঞ্জী, খদ্দরের সার্ট, পিংখাড়ু, 'ম' বাবু। একটু দূরে কুমারডুবীর শ্রীকুমার, রসগোল্লাদা, ঠাকুরপো, বঙ্কুদা একসঙ্গে রয়েছেন। আগে পরে আছেন আরও অনেকে। এইভাবেই এগিয়ে যাওয়া।

পথ চড়াই। তবু সব চটিতে বিশ্রামের প্রয়োজন নেই। আমরা এগিয়ে চলি। পথে একটা ছোট্ট দোকানে 'জরিনা ফ্রুট গার্ডেন'-এর সুস্বাদু মাল্টালেবু পাওয়া গেল। শিশি করে লেমনজ্যুসও বিক্রী হচ্ছে। সাধ্যমত রসদ সংগ্রহ করি।

নলাশ্রম চটি পেছনে পড়ে রইল।

৺কেদার দর্শনের পর এতটা পথ নেমে এসে আমাদের যেতে হবে ৺বদরীর পথে উখীমঠে। মনে রাখবেন—বললেন 'ম' বাবু।

কি, ভয় দেখাচ্ছেন নাকি? আমরা সব এক একটি খুদে তেনসিং। —হেসে বললেন ডাক্তারবাবু।

এম. পি কই? এম. পি-কে দেখছি না,—আমি বলি।

এম. পি এল কোথা থেকে, 'ম' বাবু উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

পাহাড়ের পথে এম. পি-ই তো থাকে—গুরুজী জবাব দিলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে।

পুলিসের দরকারটাই বা কি। তাছাড়া, মাউণ্ডেড পুলিশ, ওহো বুঝেছি, মমতার কথা বলছেন। মমতা পুরোকায়স্থ। ওকে নিয়ে মুস্কিলে পড়েছি আমি।

কেন ?—গুরুজীর প্রশ্ন।

বলছে হেঁটে যাব, কিন্তু ওই রোগা শরীরে কি পারবে ?

মনের জোর থাকলে হয়ত পারতে পারে—আমি বলি।

থামুন তো মশাই আপনি। শেষে মাঝপথে কিছু একটা হোক। আমি বলছি ঘোড়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, ও রাজী হচ্ছে না।

থীরু বললে, আমরা আর কি করতে পারি !

বলুন না আপনারা একটু বুঝিয়ে। আপনাদের কথা শুনলেও শুনতে পারে—বিচক্ষণ 'ম' বাবু যেন একটা অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করলেন।

অসময়ে 'ম' বাবুকে পঞ্চপাণ্ডবের স্মরণাপন্ন হতে হয়। রোগা-পানা এম. পি শেষপর্য্যন্ত ঘোড়া নিতে বাধ্য হলেন আমাদের সঙ্গে কথা ক'য়ে।

বিউঙ্গ চটি এসে পড়ল। দুধ খাওয়া হল এখানে। রাঙাদি মিছরী বের করে দিলেন। গরম ও টাটকা দুধ খেতেও অনেকের ভয়। আমি চা খাইনা, পানীয় হিসেবে সারারাস্তা দুধ খেতে খেতে গেছি।

আমার একটু একটু করে দুধ খাওয়া দেখে চট্টি চ্যাটার্জ্জী বললে, একটা ঝিনুক আনলেই ভাল হত।

একটি যুবতী বৌ শুকনোমুখে আমার পাশে এসে দাঁড়াল। বোধ হয় কিছু বলবে এই প্রত্যাশায় তার দিকে চোখাচোখি তাকাতেই মেয়েটি ভাঙ্গাভাঙ্গা হিন্দীতে জানতে চায়, জ্বরের ওষুধ আছে কি না।

ওষুধ ছিল আমাদের কাছে। প্রশ্ন হল, কার অসুখ। মেয়েটি জানাল, তার স্বামীর অসুখ। যদি কোন সহৃদয় যাত্রী এককণা ওষুধ দিয়ে সাহায্য করে, সে প্রার্থনা জানাবে বাবা ৺কেদারনাথের কাছে তার মঙ্গলের জন্যে।

বাস্তবিক, অতি গরীব এখানকার অধিবাসীরা। পরণে জীর্ণ কম্বলের পোষাক, শতছিন্ন, তালিমারা। বৃত্তি হিসেবে বললে ঠিক বলা হবে না, খণ্ডকালের বৃত্তি (পার্ট-টাইম) এদের ভিক্ষা করা। ভাগা স্নুই নয়, জামা কাপড়, ওষুধ, জুতো, পথ্যি সবই চায় এরা।

গুরুজীর ডাক্তারী চলল। চট্টি চ্যাটার্জীর কাঁধে ঝোলান ব্যাগ থেকে ওষুধের প্যাকেট বেরুল। রোগের লক্ষণ শুনে কয়েকটি বড়ি দিলে গুরুজী মেয়েটির হাতে, বলে দিলে সেবনবিধি।

ওষুধটা হাতে নিয়ে মেয়েটি বললে, তোমরা আমার স্বামীকে দেখবে চল। তোমাদের দেখলেই আমার স্বামী ভাল হয়ে যাবে।

ইচ্ছে থাকলেও যেতে পারিনি আমরা।

সে আবার বললে, তোমরা মানুষ নও, দেবতা। আরও তো কত যাত্রী যায়, কেউ দেয় না ওষুধ।

ওর চোখ ছলছলিয়ে ওঠে। ফেরবার পথে আসব কথা দিয়ে এগিয়ে চলি আমরা। একটুও বিচলিত যে হইনি একথা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে।

পথ চড়াই। রোদ ক্রমশ তেতে ওঠে। দল বেঁধে গল্প করতে করতে চড়াই পার হওয়া বেশ আনন্দের। ভীষণ তেষ্টা, তবু জল খেতে হয় র‍্যাশন করে। কি রকম একটা ভয় ঢুকে গেছে আমার, যে বেশী জল খেলেই আমাশা হবে। পাহাড়ী আমাশায় অনেকদিন আগে আমার এক বন্ধুকে ভুগতে দেখেছি দার্জিলিঙে বেড়াতে গিয়ে। পিংখাড়ুর সে ভয় নেই। কোঁৎ কোঁৎ করে জল খাচ্ছেন।

চলেছি তো চলেইছি। ধুলোয় পা বসে যাচ্ছে ছ' ইঞ্চি করে।

এই কি তীর্থ রজঃ ? ফিরে গেলে কি এরই লোভে শুভার্থীদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যাওয়া দেখতে হবে !

ধীরু বললে, নেব নাকি শিশিতে পুরে ?

ডাক্তারবাবু বললেন, এখনই দরকার কি ?

৺কেদারনাথ দর্শন সেরে যাঁরা ফিরছেন, তাদের চোখমুখের দিকে তাকিয়ে দেখি। প্রসন্নতা আর কষ্ট, ক্লান্তি মিশে গেছে একেবারে। সাইটসিয়ারবেশে যিনি সুন্দরের জগতে প্রবেশ করলেন, লেমনজ্যুস আর মিছরী মেওয়া তার ব্যাগ থেকে কখন এক এক করে নিঃশেষ হয়ে গেছে তারই অজান্তে, টের পাননি তিনি। সাইটসিয়ার ও ট্যুরিষ্ট যে একসময় পরিব্রাজক হয়ে ওঠেন, তা বুঝি জানা যায় না। এ পরিবর্তন অনেকেরই হয়।

বুড়াশিলার ছোট চটি পেছনে পড়ে রইল। পাঁচহাজার ফিট ওপরে উঠে এসেছি। যত ওপরে উঠছি. ততই ভাল লাগছে। আমরা অনেকের পেছনে আছি, আমাদের পেছনে আছেন অনেকে।

আমি দিচ্ছি টারজেনের মত ডাক। পাহাড়ের কোলে কোলে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসার পরই শোনা যায় পঞ্চপাণ্ডবের আর একজনের প্রত্যুত্তর। অন্যান্য যাত্রীরা বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে থাকে আমাদের দিকে। কেউবা সহাস্য অভিবাদনে আনন্দ প্রকাশ করে। মাঝে মাঝে গুরুজীর 'চল বেটা' ডাকে ঝিমিয়ে পড়া শ্লথগতি হয়ে ওঠে দ্রুত।

মহিষখণ্ড চটিতে দেখা হল কারও কারও সঙ্গে।

এম. পি বললেন, সত্যিই, ঘোড়ায় না চাপলে ভারী কষ্ট হত।

ওঁর কথা শেষ হতে না হতেই মধ্যমপাণ্ডব বললে, ঘোড়ায় চেপেও তো কষ্ট কম দিচ্ছেন না বেচারীকে। ভারী মোট বওয়া অভ্যেস ওদের। হাল্কা শরীর আপনার, ওর নিশ্চয়ই অস্বস্তি হচ্ছে।

আমি না হয় একটু রোগাই আছি, তা বলে অত ঠাট্টা করার মানে হয় না। আপনি হেঁটে আসছেন তাই রক্ষে। আপনি ঘোড়ায় চাপলে ও বেচারী মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে।

একেবারে ডাইরেক্ট হিট।

মধ্যমপাণ্ডব হেসে জবাব দিলে, তবুও ও গর্ব্ব অনুভব করবে মধ্যমপাণ্ডবকে পিঠে বসিয়েছে বলে।

আর সবাই উপভোগ করে এমনি ধারা কথা কাটাকাটি।

দাদা, একটু তানসেন ছাড়ুন, বললেন কুমারডুবীর শ্রীকুমার।

সুরু করলাম, এই যে পাবেন পাঞ্জাবের তানসেন গুলি। বাত, বেদনা, বদহজম, বদখদ বেমারী, সর্দ্দি, দরদ সব দূর করে দেবে। এক গুলিতে সাতদিনের ফল, মাত্র একটাকা। গাড়োয়ালীদের জন্যে আটআনা। আর যাদের বুদ্ধি গাড়োয়ালীদের মত, তাদের জন্যে চারআনা।

হেসে ওঠে সবাই, কিন্তু নিজেকে গাড়োয়ালী প্রমাণ করে সস্তায় ওষুধ কিনতে আসে না কেউ।

রাঙাদি বললেন, গোমড়ামুখে হাসি ফোটাতে আপনি দেখছি অদ্বিতীয়।

মুক্তিবৌদি বললেন, তানসেন ভাল গান গাইতে পারতেন। আমাদের তানসেন ভাই কি কেবল গুলিই বেচবে ?

গুরুজী বললে, দেখাই যাক না শেষ পর্য্যন্ত।

বৌরাণীর ইতিমধ্যে মহিষমর্দ্দিনীর প্রাচীন মন্দিরে পূজো দেওয়া সাঙ্গ হয়েছে। পাশেই লোহার শেকলে ঝোলান দোলনা। আমরা সবাই এক এক করে দোল খাই সেখানে। যাঁরা দোল খেতে চাইলেন না, আমরা তাঁদের বলি, ভীতু। ওঁরা আমাদের বললেন, নিছক বাহাদুরী। শুভ্রতুষারকিরীটিনী পর্বতের বুকের সবুজ অঙ্গবাসকে ব্যাকগ্রাউণ্ড করে দোলনরত আমাদের কারও কারও ছবি তোলে ধীরু। এক একবার ক্যামেরায় শব্দ হয় ক্লিক আর এম. পি হাততালি দিয়ে বলে ওঠেন, ওয়াণ্ডারফুল। মুক্তোদাদা বলেন, লাভলি।

পাহাড়ী ক্ষেতের পাশ দিয়ে হেঁটে চলে পঞ্চপাণ্ডব। ছোট্ট ক্ষেত। গাড়োয়ালী মেয়েপুরুষ কাজ করে সেখানে গালগল্প করতে

করতে। লাঙ্গল নিয়ে জমি চাষ করছে আর ওরই ফাঁকে ফাঁকে বিস্ময়-বিমুগ্ধ নেত্রে দেখছে আমাদের দিকে।

ফাটা চটি পর্য্যন্ত হেঁটে সে বেলায় বিশ্রাম। চটি সম্পর্কে আমার ধারণা ক্রমশ পালটাচ্ছে। মাছির উপদ্রব না থাকলে বেশ দিনকতক থাকা যেত এখানে। যার যেদিকে নজর। কেউ চলল জিলিপীর দোকান খুঁজতে, কেউ পাহাড়ী গাই নিরীক্ষণ করছে। খোঁজ করছে কত দুধ দেয়, কত লাভ থাকে। কেউ দেখছে ভাল ভাল কুকুর ছানা। বাস্তবিক, রোমশ জাতকুকুর দেখলে কার না ভাল লাগে।

আমি একবার আমার বন্ধু অচিন্ত্যর বাড়ী চায়ের নেমন্তন্ন রাখতে গিয়ে কি রকম বিপদে পড়েছিলাম, সে গল্প করি ওদের কাছে। থীরু শোনে মন দিয়ে।

বলি, নির্দ্দিষ্ট সময়ে অচিন্ত্যর বাড়ী পৌঁছে দেখি লোক নেই, জন নেই, গেটটা বন্ধ। গেটের সামনে মস্ত বড় এক টিনের পাতে লেখা, 'কুকুর হইতে সাবধান'। অচিন্ত্য যে কুকুর পুষতে সুরু করেছে, তা জানতাম না। আমার আবার কুকুরে বড় ভয় দেখতে যত সুন্দরই হোক না কেন। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকি। কিছুক্ষণ পরে ভেতর থেকে একটি লোককে বেরিয়ে আসতে দেখে তাকে বলি আমাকে সঙ্গে করে ভেতরে নিয়ে যাবার জন্যে। কাজের অজুহাতে সে আমাকে সরাসরি ভেতরে যেতে বলে নিজের কাজে চলে যায়। আরও কিছুক্ষণ গেল। বাজার থেকে ফিরে এল লোকটি। এবারে তার পিছু নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ি। লোকটি গিয়ে মনিবকে বললে আমার ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকার কথা। শুনে অচিন্ত্য খুব খানিকটা হাসলে একচোট; তারপর বললে, ওই নোটিশটা দেখেই ঘাবড়ে গেলি! কুকুরের ডাক শুনেছিস একটাও। ব্যাপারটা কি জানিস, এ বাড়ীটা যাদের কাছে কিনেছি, তাদের দুটো এ্যালসেসিয়ান কুকুর ছিল। কুকুর দুটোই মরে গেছল কিন্তু ওরা নোটিশটা আর খোলেনি। আবার

কুকুর কিনবে এইজন্যেই বোধ হয়। আমি তখন খুব রেগে গেছি। বললাম, তুমি খোলনি কেন। অচিন্ত্য বললে, ওটা আমার গেঁতোমি।

বাড়ীতে ডেকে এনে দরজার গোড়ায় 'কুকুর হইতে সাবধান' নোটিশ ঝোলানোর অভব্যতা সম্বন্ধে একটা ছোটখাট বক্তৃতার খসড়া মনে মনে করেছিলাম, কিন্তু সেটা আর বলা হল না।

থীরু সব শুনে বললে, যেমন তোমার অত ভয়, তেমনি জব্দ।

'ম' বাবু বললেন, বদরীনাথের পথে এর চেয়েও ভাল কুকুর দেখতে পাবেন।

বরফের মত ঠাণ্ডা বললে যা বোঝায়, নলের জল তার চেয়েও বেশী ঠাণ্ডা। আর কি তোড়! মুখের কাছে কোন পাত্র ধরার পর সরিয়ে আনলে দেখা যাবে অর্দ্ধেকটা ভর্তি হয়েছে। পূরো ভর্তি হয় না পাত্র। স্নান করতে ভরসা হয় না।

বোষ্টমাসী হুড়হুড় করে ঠাণ্ডা জল ঢাললেন মাথায়। কেউ কেউ বসে গেলেন সাবান কাচতে। আমার ওসব পাট নেই। জংবাহাদুরই মার্জনা করে জামা কাপড়, নিজেকে মার্জনা করি শরীর বুঝে।

গুজরাটিদের একটি দল এসে পড়ল। এক জনের ডাণ্ডীতে ছোট্ট একটি কুকুরছানা। পাচ টাকায় কেনা হয়েছে জানালেন। তীর্থ করতে এসে কুকুরছানা কেনার ব্যাপারটা আমার কেন জানি না ভাল লাগেনি।

চট্টি চ্যাটার্জীকে বালতী মগ হাতে করে নিয়ে যেতে দেখে রাঙাদি বললেন, চান করো না ভাই, ঠাণ্ডা লাগবে।

কি করব, আমার যে ভীষণ গরম হচ্ছে। অল্প জলেই সেরে নোব—বলে ঝরণার দিকে যায় সে।

অনেকগুলি দোকান আছে। জিনিষপত্র পাওয়া যায় সব রকমের।

খাওয়াদাওয়ার পাট চুকতে বেলা হয়ে গেল। দিদিমনির পায়ের দিক থেকে আস্তে আস্তে কম্বলটা টেনে নিয়ে এলিয়ে দিই নিজেকে। থাক্কুর মাউথঅর্গানে হাল্কা গানের সুর বেজে ওঠে।

গুরুজী বললে, আবার শুতে যাচ্ছ কেন। উঠে পড়, নয়ত আলিস্যি আসবে।

পুঁথি হাতে একটি লোক নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিয়ে কেদারনাথ মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে বসল। খানিকটা শোনাবার পর সাহায্য চাইল। চাইবে আমরা জানতাম। পয়সা অনেকেই দেবেন, আমরাও দোব। কিন্তু দেবার আগে আমি তাকে মহেশ্বর স্তোত্রাবলি পাঠ করে শোনালাম।

গুরুজী তাকে বুঝিয়ে বললে, যাও ভাই, কাটাকাটি হয়ে গেল।

তার কথায় হেসে ওঠে সবাই। পণ্ডিতজী বিমূঢ়। পরে অবশ্য ব্রাহ্মণের ছেলেকে অর্থ সাহায্য করা হল সাধ্যমত।

সে পয়সা নিয়ে চলে যেতে না যেতেই এল আর একজন তামার বালা বিক্রী করতে। চার আনা, পাঁচ আনা করে জোড়া। এই বালা ৺কেদারনাথে স্পর্শ করিয়ে পরতে হয়, তাতে না কি মঙ্গল হয়। পাইকারী হিসেবে কেনা হল ডজনখানেক। রসগোল্লাদার হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে দেখে সহানুভূতিশীল একজন তাকে বালা কিনতে বললেন।

রসগোল্লাদা উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁ মশাই, সত্যিই ভাল জিনিষ? কোমরে যে ভীষণ ব্যথা।

খদ্দরের সার্ট বললেন, নিয়েই দেখুন না।

বি. বি. সি. বললেন, ভক্তি থাকলে সবই হয়।

সত্যিই তো ভক্তি আর বিশ্বাসের জোরে পঙ্গু গিরি পেরিয়ে যায়। এই নিয়ে কিছু দিন আগে বেশ খানিকটা তর্ক হয়েছিল ম্যাগনোলিয়ার রেষ্টুরেন্টে বসে। সেই কথা মনে পড়ে যায়। এক-পক্ষে আমরা তিন বন্ধু, আমি, অচিন্ত্য আর বিকাশ। অপরপক্ষে বিকাশের বৌদি, আমার দিদি ও জামাইবাবু। বিকাশ বললে, ঈশ্বর যদি আছেন, তবে গরীব দুঃখী ভিখিরীদের অবস্থার উন্নতি হয় না কেন। কেন হয় না তাদের দুঃখমোচন। তারা কি ভগবানকে ডাকে না। জামাইবাবু বললেন, ডাকে বটে, তবে একান্তমনে ডাকে না।

আমি বলি, একান্তমনে ডাকার অর্থ কি? জবাব দেন বিকাশের বৌদি, একান্তভাবে ডাকার কথা বলতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সেই বিখ্যাত গল্পটা বলতে হয়। শিষ্যকে নাকানি-চোবানি খাইয়ে গুরু জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কেমন লাগছে অবস্থাটা। শিষ্য বলেছিল, জল থেকে উঠে পড়বার জন্মে প্রাণটা আকুলিবিকুলি করছিল। গুরু বলেছিলেন, ভগবানকে পাবার জন্মে প্রাণটা যখন অমনি আকুলি-বিকুলি করবে, তখন বোঝা যাবে ভক্তির জোর। অচিন্ত্য বললে, আমার তো মনে হয় মানুষ বিপদে পড়লেই তাঁকে ডাকে এবং এই ডাকার মধ্যেই থাকে আন্তরিকতার সুর। কিন্তু কই তিনি তো আসেন না বিপদ তারণ করতে। দিদি বললেন, শুধু আন্তরিকতা থাকলেই চলবে না, বিশ্বাস চাই। সরল বিশ্বাস নিয়ে ডাকলে তিনি কি না শুনে থাকতে পারেন। তিনি যে ভক্তবৎসল। আমি বলি, বেশ তো ধরো, সারাটা বছর আমার বই রইল শিকেয় তোলা। আমার বিশ্বাস আমি পরীক্ষায় পাশ করবই আর সেই বিশ্বাস নিয়ে যদি ঈশ্বরকে ডাকতে সুরু করি আমায় পাশ করিয়ে দেবার জন্মে, তাহলে ফলটা কি হবে শুনি। জামাইবাবু বললেন, ভুল করলে যে ভাই। বইয়ের সঙ্গে যদি সম্পর্কই না রইল, তবে পাশ যে করবে, এ বিশ্বাসটা আসবে কোথা থেকে। বিকাশ বললে, নিজের পড়ার ওপর বিশ্বাস থাকলে আর ঈশ্বরকে নিয়ে টানাটানি করি কেন। কেউই আর হারবার পাত্র নই। সেদিন তর্কের মীমাংসা হয়নি। কফির পর কফির কাপই খালি হয়েছিল শুধু।

রসগোল্লাদা বললেন, ভক্তি কি আর সব মানুষে থাকে, না সব মানুষে সমান হয়।

নীলগেঞ্জী বললেন, তা থাকে না বটে, তবে ভক্তি কালচার করতে হয়।

কম্বলটার কোণে শুয়ে ওদের কথা শুনতে শুনতে ঝিমুনি এসে গেছল। ধীরু ঝাঁকানী দিয়ে তুলে দিল। আর ক্লান্তি নেই।

বিশ্রাম লাভে ক্লান্তির অবসান। চাবুক খেয়ে যেমন লাফ দিয়ে ওঠে ঘোড়া, তেমনি বিশ্রামরত এই দলটি যেন আশার চাবুক খেয়ে উঠে বসে। সাজ সাজ রব পড়ে যায় চতুর্দ্দিকে।

দূরে আছেন যিনি, তাঁকে একান্তে আপনার করে পাবার জন্যে তৈরী হয় মন। তাঁকে পেতে গেলে চলতে হবে আমাদের। নির্বিকল্প সমাধি তো আমাদের নয়। দর্শনলালস শুধু। পথ প্রিয়, তাই আবার সুরু হবে পথ চলা।

গুরুজী এল নীচে থেকে। মাছির কামড়ে দগদগে ঘা হয়েছে বটকেষ্টর। গরম জলে কম্‌প্রেস্‌ করে ওষুধ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে এল। ফাটা চটির ফাটাফাটি কাণ্ড শেষ।

রাস্তা এবারে কখনও চড়াই, কখনও উৎরাই। সারিবন্দী রাজস্থানবাসীদের একসঙ্গে যাওয়া দেখতে দেখতে আমরা এগিয়ে চলেছি। একটি বৃদ্ধ ইশারা করে ডাকে। কাছে যেতে নীরবে সে চোখের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। দেখি দুচোখে ছানি পড়েছে। একে আর কি ওষুধ দোব! থীরু কয়েকটি চিউইং গাম বের করে তার হাতে দিয়ে দিল।

প্রতারণা বা প্রবঞ্চনা, কী বলবেন এটাকে। এ কথা সত্যিই, সেদিন সেই গাড়োয়ালী বৃদ্ধ যে অসীম পরিতৃপ্তির সঙ্গে আমাদের সামনে তার ফোকলা দাঁতে এটা চিবিয়েছিল, শিল্পী হলে তার ছবি এঁকে রাখতাম।

আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ। অশ্বারোহী জন গিলপিন ত্যাড়চা চোখে বললেন, কি রকম লাগছে দাদা।

ভাবখানা এই যে তুমি আর কি আনন্দ পাচ্ছ, তোমার চেয়েও আমি আরামে যাচ্ছি।

চট্টি চ্যাটার্জী বললে, ভালই তো লাগছে। হেঁটে যাওয়ার একটা চার্ম আছে।

একটা ঘোড়া করেই নিলেই পারতেন। অনেকটা পথ।

দরকার হলেই নোব।

ছড়া কাটি আমি। মুখে মুখে তৈরী হয় ছড়া।

লাফিয়ে চড়ব ঘোড়া শিবাজীর ষ্টাইলে
হাঁফিয়ে পড়ব দম নিতে প্রতি মাইলে

জন গিলপিন মুখখানা গোমড়া করে চলে গেলেন।

আরও খানিকটা এগিয়ে যেতে পিংখাড়ুর সঙ্গে দেখা। একটি পাথরে বসে হাঁফাচ্ছেন। উনি কিন্তু বেশ হাঁটেন।

আমাকে দেখতে পেয়ে বললেন, দেখেছেন তানসেন, কেমন সুন্দর দৃশ্য, কি সুন্দর বনপথ। আচ্ছা ওইটা কি ফুল বলুন তো।

চলুন যেতে যেতে বলি। ওটা হচ্ছে রডোড্রেনডন।

পিংখাড়ুর সঙ্গী হয়ে হেঁটে চলি খানিকটা। এই হয়। এক একবার এক একজনকে সঙ্গী হিসেবে পাই খানিকটা পথ, আবার যে যার গতিতে চলতে সুরু করি। পথ আর পথিককে চিনতেই তো আসা। পিংখাড়ু আমাকে চিনিয়ে দেন বনগোলাপ, ডালিম, আখরোটের গাছ, আমি তাকে দেখিয়ে দিই কুন্দকুরুবকের ঝাড়।

এক এক জায়গায় গাছের ছায়ায় পথটা শীতল। গাছের গভীরতায় বাতাস গভীর। এক একটা চটির আশে পাশে দু একটা পল্লী। দেখতে দেখতে পট পরিবর্তন হল। রৌদ্রস্নাত বৈশাখের উত্তাপের প্রখরতা নেই। যেটুকু আছে, তাও কমে আসে। বেশ লাগছে হেঁটে যেতে।

এলাহাবাদের পিসীমা বললেন, বাবার কি মহিমা। কত সুখী মানুষ চলেছে কষ্ট করতে করতে। বাড়ীতে কত চাকরবাকর, আর এখানে নিজে হাতেই সব করছে।

ঠাকুরপো বললেন, ঠিক বলেছেন। সংসারে এটারও প্রয়োজন। শ্রেণী বৈষম্যের কুফল তো হাতে হাতে পাচ্ছি, এটা যেন আমাদের প্রায়শ্চিত্তির।

কি বললে বাবা—ঠাকুরপোর দার্শনিক তত্ত্ব বুঝতে পারেননি এলাহাবাদের পিসীমা।

মানে ভগবানের ইচ্ছে সবাই সব কাজ করুক। বাড়ী ফিরে গিয়ে চাকরবাকরদের মাইনেটা যদি বাড়ে, সুখ সুবিধেটা যদি বাড়ে, বাবা ৺কেদারনাথ তাহলে খুশীই হবেন।—ঠাকুরপো হন হন করে পা চালান।

সেবার জানলে বাবা, এলাহাবাদের পিসীমা গল্প করেন, মথুরা বৃন্দাবন সেরে গয়াতে এলুম। গয়াতে ধর্মশালায় আমার সঙ্গিনী ছিল মন্টুর মা। আমার চেয়েও বয়সে ছোট। অমন সতীসাধ্বী লক্ষ্মী মেয়ে আমি দেখিনি। গয়াতে তখন পাণ্ডারা খুব অত্যাচার করত। মন্টুর মাকে সঙ্গে নিয়ে আমি বেরিয়েছি পূজো সারতে, একটা পাণ্ডা পিছু নিল। কিছুতেই ছাড়বে না। মন্টুর মা বললে, দিদি এ লোকটা বড় বেয়াদপ। দোব সায়েস্তা করে। আমি 'হ্যাঁ' বলামাত্র এমন তেড়েমেড়ে গেল লোকটার দিকে যে লোক জড় হয়ে গেল। তারপর যখন সবাই পাণ্ডাকে ঘিরে ধরেছে তখন একফাঁকে পালিয়ে আসি আমরা।

গুরুজী বললে, আপনার গল্প শোনবার জন্যে যে এখানেই ভীড় জমে গেল।

ভীড়ই বটে, নানা চরিত্রের ভীড়। দুদিনের এই মেলায় হরেক রকম লোক।

মাঝে মাঝে মুক্তোদাদার গলা পাওয়া যাচ্ছে, 'লাভলি, লাভলি'। সুন্দর দৃশ্য দেখে চুপ করে থাকতে পারেন না তিনি। বাস্তবিক এ উচ্ছ্বাস, এ ভাবাবেগ চেপে রাখা যায় না। জনি ওয়াকার ঘোড়া থামিয়ে একদৃষ্টে দেখছে খাদের দিকে। দেখে নাও ভাই, এ বনানী, এ পাহাড়, এ পথ কোথায় পাবে!

রামপুর চটিতে পৌঁছুলাম যখন, তখন সূর্য্য ডুবে গেছে। দোতলা একটা চটিতে জায়গা পেয়েছে ধীরু। ধীরুর পাওয়া মানেই পঞ্চপাণ্ডবের পাওয়া।

একটি দোকানে সিলোন রেডিওর গান হচ্ছে। কদিন খবরের

কাগজের মুখ দেখিনি। বাহির বিশ্বের কোন খবরই পাচ্ছি না। আমাদের অনুরোধে দোকানী কাঁটা ঘুরিয়ে দিলে, কিন্তু অস্পষ্ট আওয়াজে খবরটা শোনা গেল না।

নূরজাহান ও জাহাঙ্গীর একটি দোকানে বসে তামার বালা তৈরী করা দেখছেন। সারি সারি কর্মকারদের দোকান। ফাল্গুনের শীত লাগে গায়ে বৈশাখ মাসে। পাঁজী দেখিয়ে প্রমাণ না দিলে বৈশাখ মাস বলে মানতে চায় না বুঝি মন।

আস্তানায় এসে কম্বল চাপা দিয়ে বসি। বৌরাণী আছেন পাশের চটিতে। সান্ধ্য কীর্ত্তনের আসরে যাব কি না ভাবছি। যা ঠাণ্ডা। ও মা, ওরাই যে এসে পড়লেন। বৌরাণী, রাঙাদি, এম. পি., দিদিমণি, মুক্তিবৌদি, মুক্তোদাদা, 'ম' বাবু ও পিংখাড়ু হৈ হৈ করতে করতে ঘরে এলেন।

মধ্যম পাণ্ডব আমাকে ঠেলা দিয়ে বললে, তানসেন, উঠে পড়। অতিথি সৎকার কর।

এ কাজের ভার চট্টি চ্যাটার্জীর—আমি তার দিকে চেয়ে বলি।

সে অমনি উঠে লেমনলজেন্স বার করে সকলের হাতে দেয় একটা করে।

তারপর সুরু হয় ভজন। 'ভজ রাধাকৃষ্ণ, গোপালকৃষ্ণ', 'প্রভুমীশ-মণীশ মনেষ গুণং', 'রচিত পাণ্ডব রুচির মন্দির'—সমবেত কণ্ঠে গীত হয়ে এক মাধুর্য্যমণ্ডিত পরিবেশের সৃষ্টি করে। বোষ্টমাসীর নিদ্রাভঙ্গ হয়। উঠে এসে উদাত্ত কণ্ঠে গেয়ে ওঠেন আমাদের সঙ্গে।

জানি না এরপর পথশ্রমে নিত্যকার সান্ধ্য কীর্তনের পালা শেষ হবে কি না, যতক্ষণ পারব এইভাবে আমরা মনকে প্রফুল্ল রাখবার চেষ্টা করব। রাগ, দুঃখ, অভিমান এ সমস্ত অনুভূতির বাসা মনের যে কোণে, সেইখানেই আছে হাসি, উচ্ছ্বাস, আনন্দ। ওদিকের দরজাটায় খিল দিয়ে একটু এদিকের চত্বরে বসো। আরো পাঁচজনকে ডেকে বসাও সেখানে। আলোকিত হয়ে উঠুক দুশ্চিন্তার অন্ধকারে ঘেরা

ঘুপসীটা। নির্জন প্রান্তরে শত শত যাত্রীর মনের ভেতর একটুও যদি প্রবেশ করে সেই বাধাহীন আনন্দ-আলো রেখা, ক্ষতি কি!

ছোট রাত। জ্যোৎস্না ছড়ানো ধূসর পাহাড়ের মাথায় তারার আলোর ঝিকিমিকি। লেপ কম্বল শীতের দিনে অপরিহার্য্য। বিছানা তেতে ওঠবার আগেই, ঘুমের জড়তা কাটবার আগেই রাত শেষ।

ভোর হলেই দাঁত মাজা, মুখ ধোওয়া। গলা খাঁকারির শব্দে ঘুম ভেঙ্গে যায়। কলেতে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। তারপর একসময় সবাই পথে নেমে পড়ি।

রামপুর থেকে এক মাইল এগিয়ে গেলে ত্রিযুগীনারায়ণের পথ।

'ম' বাবু বললেন, ফেরবার পথে ত্রিযুগীনারায়ণ দর্শন করা যাবে। এখন সোজা ৺কেদারনাথ দর্শনে যাওয়া যাক।

কথাটা ভাল লাগল। ৺কেদারনাথ বেশী দূরে নেই। দু একজন ছাড়া সবাই রাজী হল।

চার্লি চ্যাপলিন বললেন, এই যে আপনারা কষ্ট হবে বলে ঝট করে নারায়ণের ইম্পর্‌টান্স কমিয়ে দিলেন, এটা কি ভাল হল।

বঙ্কুদা বললেন, বদরীনাথে নারায়ণ আছেন। তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে নোব।

মধ্যমপাণ্ডব বললে, চেপে যাও বঙ্কুদা।

বঙ্কুদা রাগেন না। হা হা করে হেসে ওঠেন।

নন্দগোপালবাবু মায়ের কাণ্ডীর পাশে পাশে হেঁটে চলেছেন। মায়ের একটি ছেলে। এক সময় আমাকে একা পেয়ে তাঁর সাংসারিক কত কথাই বললেন। আমি নীরবে শুনে গেলাম। মনে হল ওঁর মনের মধ্যে যে অপ্রকাশ ব্যথা গুমরে গুমরে মরছিল, সেটার একটু উপশম হল বোধ হয়।

বাঁ হাঁটুতে একটু ব্যথা হয়েছে। তাই সাবধানে পা ফেলে চলি।

ডাক্তারবাবু বললেন, কি হল মালাইচাকীতে। তানসেন গুলি কাজ করছে না বুঝি।

হেসে জবাব দিই, ওষুধে যদি ব্যথা না সারে বাউল গানে অন্তত সেরে যাবে।

কি রকম ?

চলুন, সামনের চটিতে শোনাব।

কথাটা কাল থেকেই ভাবছি। গুরুজী তার চেলার বিষয়ে মুক্তি-বৌদির কাছে যখন বড় মুখ করে বলেছেন, তখন গান তানসেনকে গাইতেই হবে। গান আর কি, আনন্দের একটা অভিব্যক্তি। গায়ক আমি নই, তবু চলার পথে যে ছন্দ, সে ছন্দকে সুরে বেঁধে রাখবার একটা প্রয়াস করি। অর্থহীন কথার সমষ্টিও যদি হয়, তবু হয়ত চিত্তে আনবে একটু প্রফুল্লতা। হাঁটুর ব্যথার যন্ত্রণা বা কাতরতা প্রকাশ না করে সেটাকে যেন ভুলে থাকতে পারি কোনরকমে, এই দিকে লক্ষ্য ছিল আমার বরাবরই। মালিশ মলম তো কাছেই আছে।

চোখের গগল্‌স্‌টা মাঝে মাঝে খুলে ফেলি। সাদা চোখে বসুন্ধরার রূপসুধা পান করার তীব্র বাসনা মনকে পেয়ে বসে। ইচ্ছে করে ভেঙ্গে ফেলি এটাকে। এ পৃথিবীর সৌন্দর্য্যকে কালো চশমার কৃত্রিম শোভায় নাই বা দেখলাম। কিন্তু তবু চোখে ঠুলী দিতে হয়। চক্ষুরত্ন মহারত্ন। যে চোখে সুশ্যাম বনরাজিকে, সূর্য্যকিরণস্নাত শুভ্র পর্বতশীর্ষকে দেখতে চাই, সেই চোখকে বাঁচাবার জন্যেই পরতে হয় গগল্‌স্‌। নইলে গ্লেয়ার লাগবে।

পথ খুব চড়াই নয়। বোলপুরের শান্তিদিদি চলেছেন পাশে পাশে। দেশের গল্প করেন। তারপর স্বামীপুত্রের কথা বলতে বলতে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেন। বুঝতে পারি, মন কেমন করছে ছেলের জন্যে। মায়ের মন ছেলের চিন্তায় কাতর হবেই তো।

বললাম, এখন আর ওদের কথা ভাবছেন কেন।

না ভেবে যে পারি না ভাই।

সত্যিই তো, মানুষ যে জন সে তো ভাববেই। ভালবাসা আছে বলেই তো ভাবনা। অপরের জন্যে ভাবাটাই হচ্ছে মানবিকতা।

স্নেহ মমতা তো আছেই, কিন্তু শুধু স্নেহ মমতা বা শ্রদ্ধা দিয়ে তো সমাজবদ্ধ জীবের ভাব ভাবনাকে বিচার করলে চলবে না। হিউম্যান্ টাচ্‌টাও দেখতে হবে।

একটু বিশ্রাম নিলে ভাল হয়। কিন্তু তাতে যদি হাঁটুর ব্যথা বেড়ে যায়। চটি বেশী দূরে নেই। ফিরতি পথের যাত্রীদের সোচ্ছা-সোচ্চারিত 'জয় কেদার' ডাকের প্রত্যুত্তরে দ্রুত নিঃশ্বাস নিতে নিতে ক্ষীণ কণ্ঠে বলি 'জয় কেদার'। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলি।

চটির কাছাকাছি পৌঁছেই হাতের লাঠিটা দু'হাতে মাথার ওপর ধরে নেচে নেচে খোঁড়াতে খোঁড়াতে গান ধরি চীৎকার করে। সেই গান, যা কদিন মনে মনে রচনা করি। গানটা হল,

সারী বলে, শুক তোর মালাই চাকী
ফুলে ঢোল হল না কি
পথ যে অনেক বাকী
তুই যাবি কেমনে।

শুক বলে, শোন আমার সারী রাণী
এ আমি নিশ্চিত জানি
আমার এ পা দুখানি
যাবে বদরী নারায়ণে।

সারী বলে, তার আগে আছেন কেদার
রাস্তাটা নয়কো সোজার
সাবধানের নাই যে মার
তুই চল সাবধানে।

শুক বলে, তোর কথা রইল মনে
বলব সব ভক্তজনে
আসবে যারা এদিক পানে
তীর্থেরই টানে।

চটিওলা, কুলীরা, রাজস্থানীদের সেই দল, আরো অনেকে উপভোগ করে সে গান। গান শেষে বেশ কিছুক্ষণ ধরে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বর্ষিত হল। নিছক বাহবা পেতে মন চায় না, তাই লজ্জায় অভিভূত হয়ে পড়ি।

ভীড়ের মধ্যে থেকে কে একজন বলে উঠল, সাবাস ভাই তানসেন।

তাকিয়ে দেখি পিংখাড়ু। পিংখাড়ু ভাল হিন্দী বলেন। আমার গানের হিন্দী তর্জমা করেন সঙ্গে সঙ্গে। তারপর বলেন, কই তানসেন আমার পুরস্কার।

ছড়া কেটে জবাব দিই,

> পিংখাড়ু নাম তার ঢক ঢক জল খায়
> হিন্দীতে পণ্ডিত জোরে জোরে হেঁটে যায়।

আর একদফা হাসির ঢেউ ওঠে।

ত্রিযুগীনারায়ণে যাবার যে পথ আমরা ছেড়ে এসেছি, তার আর এক প্রান্ত এসে কেদারনাথের মূল রাস্তায় মিশেছে শোনপ্রয়াগের কাছে। বাসুকী গঙ্গা ও মন্দাকিনীর সংগমে শোন প্রয়াগ। নদীর গর্জন শুনতে শুনতে এগিয়ে চলি।

এক জায়গায় পথের ধারেই একটি মুণ্ডকাটা গণেশ, ছোট্ট একটি মন্দির। মা ভগবতীর কোপে সন্তানের মুণ্ডকাটার গল্প শোনালেন পাণ্ডা। পার্ব্বতী ও গণেশের উপাখ্যান। যথারীতি ভেট চড়ানো হল।

ভাবতে বসলে অবাক হতে হয়, সারা হিমালয়ের বুকে এমনি ধারা কত সহস্র মন্দির আমাদের ধর্মকথার উপাখ্যানের সাক্ষী হয়ে বিরাজমান। এখানে নিত্য পূজা হয়, হয় আরতি। এই তো দেবলোক। এ স্থানের ধুলিরেণু দেবতারই চরণস্পর্শে পূত। তাই বুঝি তীর্থের রজঃ নেবার জন্যে ব্যাকুল হয় মন।

চড়াই পথে এগিয়ে চলেছি। একপাল ভেড়া এসে পড়ল পেছন থেকে। ওদের অগ্রাধিকার না নিলে গুঁতিয়ে দেবে হয়ত, এই ভয়ে

সরে দাঁড়িয়ে ওদের পথ করে দিই। এক, দুই, তিন....কত আর গুণব, অগুণতি ভেড়া।

গৌরীকুণ্ডে পৌঁছে গেলাম সকাল সাড়ে নটায়। জনি ওয়াকার ঘোড়া থেকে নামতে গিয়ে আর একটু হলেই পড়ে যাচ্ছিলেন। ঘোড়াওলা ধরে ফেলল। 'ম' বাবুর ব্যবস্থাপনায় আমাদের খাওয়া থাকার চিন্তা নেই। খচ্চরের পিঠে মাল পত্তর চাপিয়ে দিয়ে উনিও নিশ্চিন্দি।

গৌরীকুণ্ড জায়গাটি বেশ, এইটুকু বললে বোধ হয় সব বলা হয় না। প্রায় সাড়ে ছ'হাজার ফিট উঁচু। চটির অনতিদূরে প্রচণ্ডবেগে বয়ে চলেছে মন্দাকিনী। অটল পাথরের গায়ে আছড়ে পড়ে নিজেকে চূর্ণবিচূর্ণ করে কি আনন্দ সে পায়? দেখতে পাচ্ছি প্রচুর পরিশ্রমে ওর মুখ দিয়ে ফেনা ওঠে, স্বচ্ছ জল চকিতে শুভ্র ফেনার মেখলা পরিয়ে দেয় বেগবতীকে।

শীতের রৌদ্রের বেশ একটা মিষ্টি আমেজ। রোদের দিকে পিঠ করে চাতালে বসি খানিকক্ষণ। গৌরী মন্দির দর্শন সেরে গরম জলের কুণ্ডে স্নান সেরে নিই এক এক করে। হাঁটুর ব্যথা অন্তর্হিত।

গৌরীকুণ্ডে গৌরীমাতা ঋতুস্নান করেছিলেন। কুণ্ডে সংকল্প সারতে বসেন কেউ কেউ।

রাজস্থানের সেই দলটি আমাদের আগেই এসে পড়েছে। মেয়ে-পুরুষ একসঙ্গে হুটোপাটি করে ঐ গরম জলাধারে ডুব দিচ্ছে। অসীম সহ্য শক্তি দেখে স্তম্ভিত হয়ে যাই।

ধীরু বললে, বাহাদুরি।

চার্লি চ্যাপলিন বললে, মনের জোর।

আমি বলি, ঠাকুরের কৃপা।

চটির ঠিক সামনেই বাঁধানো চাতাল। তার একপাশ দিয়ে ছোট্ট একটা পথ নেমে গেছে নদীতে। সেখানে গরম জলের আর একটি

নল। ঠাণ্ডা ও গরম জল এ রকম পাশাপাশি পেয়ে অনেকেই কাপড়-জামা কাচা, স্নান করা সেরে নেন।

ঘরে বসতে মন চায় না। মাউথ অর্গান নিয়ে, ক্যামেরাকে বগলদাবা করে আবার বেরিয়ে পড়ি দল বেঁধে।

পথে কয়েকটা পোকা অনেকক্ষণ ধরে জ্বালাতন করছিল আমাদের।

মধ্যম পাণ্ডব বললে, এগুলি উচ্চিংড়ী।

আমার দেখে মনে হচ্ছিল গঙ্গাফড়িং জাতীয়। সেকথা বলতে অমনি তর্ক সুরু হয়ে গেল। থীরু এল আমার দলে, চট্টি চ্যাটার্জী গেল মধ্যম পাণ্ডবের দলে।

জজের ভঙ্গীতে রায় দিলে গুরুজী, তর্ক নয়, সন্ধি করো। এ হচ্ছে গঙ্গা চিংড়ী।

গুরুজীর কথা শেষের আগেই একটি পোকা গুরুজীর নাকে কামড় দিয়ে পালিয়ে যায় তার চারটি চেলাকে বোকা বানিয়ে। কামড় খেয়ে গুরুজী বললে, এদের সঙ্গে কখনও সন্ধি করো না।

পোষ্টাফিসের দিকে কয়েকটি দোকান। আলাপ হল পোষ্টমাষ্টারের সঙ্গে। তিনি একাধারে পোষ্টমাষ্টার ও দোকানদার, শিলাজিতের ব্যবসায়ী। বিশুদ্ধ শিলাজিতের ব্যবসায়ীরা রাস্তায় পোষ্টার মেরে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। এটি একটি পাহাড়ী মিনারেল, আঠার মত চটচটে।

আমরা খরিদ্দারের সত্বাটা মুছে ফেলে ওঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করাতে উনি খুশী হন। ছোট্ট একখানি ঘরে একপাশে অনেকগুলি শিশি, একপাশে একটি তক্তপোষে কিছু কাগজপত্র ও লেখবার সরঞ্জাম। চট দিয়ে পর্দা করা ঘরের অপর অংশে মেয়েদের কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে। তিনটি ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে কষ্টের সংসার তাঁর। শিলাজিত বিক্রী করে উপায় মন্দ হয় না, কিন্তু যাত্রী সমাগম কেবল ছয় মাসের জন্য। অন্য ছয় মাস সংসারের মাথা এই লোকটাকে চিন্তিত রাখে, এটা অনুমান করি।

বেরিয়ে ফিরে এসে দেখি, রান্নার তখনও অনেক দেরী। জনকয়েক 'ম' বাবুকে ঘিরে দেরী হওয়ার জন্য কথা শোনাচ্ছে। আশ্চর্য্য লোক এরা। পান থেকে চুণটি খসবার যো নেই। অথচ এদের হাতে কর্ত্তৃত্ব থাকলে 'ম' বাবুর অবস্থা এদের চেয়েও ভাল হত না। পয়সার লেনদেন হলেই বুঝি এমন হয়ে যায় মানুষ।

ডায়েরী নিয়ে বসে যাই লিখতে। মনে পড়ে জগদীশচন্দ্রের বিখ্যাত সেই লেখা, 'নদী, তুমি কোথা থেকে আসিয়াছ।' নদী উত্তর দিল, 'মহাদেবের জটা হইতে।' মহাদেবের জটা যে কি বা কোথায় তা জানি না, তবে এর উৎস যে স্বপ্নপুরীর পানে নিয়ে যায় আমাদের, সে স্থান নিশ্চয়ই এমন মনোরম বা গাম্ভীর্য্যপূর্ণ, তার সঙ্গে কেবল ধ্যানমগ্ন মহাদেবের জটারই তুলনা করা চলে। শান্তির সন্ধানী মন এ ভুবন মাঝে শান্তি পেতে চায়, তাই এই পার্ব্বত্য ধূলিধূসরিত পথে চলতে চলতে ভাবে চির শান্তির রাজ্যে একদিন নিশ্চয়ই পৌঁছে যাবে। মৌন প্রশান্ত এই মহাদেবের জটাই বুঝি তার লক্ষ্য।

আমাদের কথা লিখবেন তো—স্নান সেরে ভিজে কাপড়ের রাশ চাতালটায় মেলে দিতে গিয়ে কানের কাছে মৃদুস্বরে বললেন এম. পি।

ঠিক নেই। শেষে কি না কি লিখে ফেলব। ভয় হয়।

সত্যি বলতে কি, এটা আপনার বিনয়। আপনার নিষ্ঠা দেখে মনে হয় আপনি লেখেন। আমাদের সম্পর্কে কি লিখলেন বড় জানতে ইচ্ছে করে।—সরাসরি কৌতুহল প্রকাশে সরলতা।

যদি একান্তই লিখি, সেটা হবে বেড়ানোর গল্প। আমার লেখার মধ্যে নিজেকে খুঁজতে যাবেন না, তাহলে ঠকবেন।

চরিত্র চিত্রণে যে লেখকের স্বাধীনতা আছে, আমিও তা মানি—বলে উনি হেসে চলে গেলেন।

কি মনে করলেন আমার কথায়, কে জানে।

খাবার ডাক পড়ল। ধীরু তার বেডিঙের খোল থেকে বার করল টমেটো জেলী, মুক্তোদাদা বার করেন লঙ্কার আচার, বৌরাণী

আমের মোরব্বা। দিদিমণি ভাগ করে দেন সবাইকে। খেয়ে উঠে আবার হাঁটতে হবে, তাই উদরপূর্ত্তি অল্প করে করি।

নীরস খাওয়ার আসর রসগোল্লাদার কথায় রসালো হয়ে ওঠে। বল্লেন, রাস্তায় আজ অনেক বোকা পাঁঠা দেখলুম। ওরা সত্যিই বোকা।

কেন ওদের গায়ে কি লেখা আছে, পিংখাড়ু বল্লেন।

পিঠে গমের থলি বইছে, অথচ খাবে অন্যলোকে।

সে কথা বলতে গেলে কুলীগুলোও তো বোকা। কেননা রসগোল্লার টিনটা বয়েই মরছে, ও কি আর খেতে পাবে—ইঙ্গিত করে থীরু।

সে কি আর আছে। সে খতম—বলে গম্ভীর হয়ে গেলেন রসগোল্লাদা।

মুখ টিপে হাসলেন অনেকে।

কেদারনাথ থেকে দশ মাইলের মধ্যে এসে পড়েছি। পুণ্য আলোতে আর স্নিগ্ধ ছায়াতে ঝলমল তীর্থপথের পরিচয় নেবার জন্যে জানার গণ্ডী পেরিয়ে অজানার আকর্ষণে এগিয়ে এসেছি এতটা পথ; পথের দুঃখকষ্ট বা দুর্লংঘ্য বাধা বিপত্তিকে এড়িয়ে গেছি, সে কি বৃথাই!

সূর্য্য হেলে পড়তেই হেলে পড়া আমরা খাড়া হয়ে উঠে পড়ি সবাই। গরম জামা, কানঢাকা টুপী বার করে নিতে হল, কেননা, পৌছুতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে, আর সন্ধ্যের দিকেই শীত বাড়ে। টুক টুক করে এগিয়ে চলি আমরা। গৌরীকুণ্ড প্রতীক্ষা করে রইল ও বেলার যাত্রীর জন্য।

কেদারনাথের পথে এক মাইল দেড় মাইলের মধ্যেই চটি আছে, আছে বিশ্রাম গৃহ। দুধ, চা, পকৌড়ী, জিলিপী পাওয়া যায় সর্বত্র।

যত সাধু সন্ন্যেসী দেখতে পাব আশা করেছিলাম, তত সাধু চোখে পড়েনি। পর্বত গুহায় বা নিভৃত মঠে তেমন কাউকে চোখে পড়ল না। এক আধজনকে চোখে পড়ে, যারা আমাদেরই মত যাত্রী, সম্বল কেবল লোটা কম্বল। 'জয় কেদার' বুলির অভিনন্দন শেষে ওরা কিছু

চেয়ে বসে। বলে, ব্রাহ্মণ ভোজন করাও। পথের প্রান্তে এভাবে ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে গেলে তো সাধ্যে কুলোবে না। তাই নগদ মূল্যে তাদের আশীর্ব্বাদ কিনতে হয়।

বি. বি. সি. বললেন, আচ্ছা এইখানে এসেও লোকের ভিক্ষে চাইতে প্রবৃত্তি হয়!

গুরুজী বললে, প্রবৃত্তি যখন হয়, তখন বুঝতে হবে লোটাকম্বল-ধারী নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করতে পারেননি এখনও।

চট্টি চ্যাটার্জী বললে, ভিক্ষে করাটাই হচ্ছে ওদের বৃত্তি। কথায় বলে, আপনি বাঁচলে বাপের নাম।

রাজস্থানীদের সেই দলটা চলেছে আমার আগে আগে। ঘাঘরা আর ওড়নায় বিচিত্র বর্ণের মিছিল। পায়ে নাগরার জুতো। কেডস্ জুতোর ধার ধারে না ওরা। ওদের ভাষা বুঝি না, তবে দুটো কথা কানে এল, 'আচ্ছা গানা'। ফিস ফিস করে আমাকে দেখিয়ে কি যেন বলাবলি করে নিজেদের মধ্যে। একটি যুবক অসুস্থ একজনের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত। 'জয় কেদার' বলে তাদের পাশ দিয়ে এগিয়ে যাই।

মনোরম অরণ্যানীর মধ্য দিয়ে পথ। পা দুটো টেনে নিয়ে চলেছে দেহটাকে।

চীরবাসা ভৈরব পড়ল পথে। গাইডবুকে লেখা আছে 'ভৈরবকে বস্ত্রখণ্ড দান করিলে কেদার দর্শনে সুফল হয়।' আমার কাছে বস্ত্রখণ্ড ছিল, শুভ্র ও অমলিন।

পাণ্ডা বললে, ও চলবে না।

একখণ্ড সার্টিনের টুকরো, পাঁচ টাকা দাম চাইল। আমরা বসে পড়ি দাম শুনে।

একটু পরে বৌরাণী এলেন। দরাদরি না করে বস্ত্রখণ্ড কেনা হল এবং বস্ত্রদান করা হল। পাণ্ডার মন্ত্রোচ্চারণে তাঁর টিকিট মিলল সুফল পাবার। আমরা যারা আশেপাশে বসে পড়েছিলাম, ঐ মন্ত্র

যাদের কানে গেছে, বৌরাণীর সঙ্গ নিয়ে আমরাও পেরিয়ে আসি চীরবাসা ভৈরবকে প্রণাম জানিয়ে।

রাঙাদি বললেন, এ রকম ডবলিউ, টি করলে যে নিজেরাই ঠকবে ভাই।

আমি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিই, আমার কাছে তো কাপড় ছিল ওরা দিতে দিলে না। ঐ যে সার্টিনের কাপড়টা দেওয়া হল, আবার ঐটে অন্য যাত্রীদের বিক্রী করা হবে, এবং বস্ত্রখণ্ড দান করবেন যাঁরা, তাঁরা পেছনে আসছেন। এটাও তো ডবলিউ. টি।

গুরুজী বললে, আসল কথা হচ্ছে ভক্তি। প্রকাশ করো আর না-ই করো, যার মনে যতটা আছে, সেটাকে আঁকড়ে ধরে থাকো। কাজ হবেই।

একটানা চড়াই পার হতে হাঁফিয়ে উঠি। বিকেল গড়িয়ে আসে। জন গিলপিন ঘোড়ায় চেপে চলেছেন তার নিজস্ব ভঙ্গীতে। দূর থেকে ভেসে আসছে টারজেনের ডাক। থীরু এগিয়ে গেছে, এ নিশ্চয়ই তার গলা। প্রত্যুত্তর দিই আমি। সে ডাক শুনে চমকে ওঠে ঘোড়া, চমকে ওঠে সওয়ারী।

মৃদু হেসে ঘোড়াওলা বলে, আপ বড়ে মজাদার আদমী।

মঙ্গলচটিতে একদফা বিশ্রাম। আবার চলা। ওটা কি, সাদা মতন। ওই যে, অনেকখানি জায়গা জুড়ে যার বিস্তার রাস্তা থেকে অনেকটা নীচে। বরফ, বরফ! এত বরফ একসঙ্গে আগে কখনও দেখিনি। রাস্তা থেকে পাথর কুড়িয়ে নিয়ে সেই জমাট বরফস্তূপের দিকে ছুড়ে দিই গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে। দেখতে দেখতে পাথরটা বসে যায় গভীর গর্ত্তের সৃষ্টি করে। শিশুর উল্লাসে হেসে উঠি।

হু হু করে হাওয়া বইছে। একটা যেন দুর্যোগের পূর্ব্বাভাস। কনকনে হাওয়া গায়ে যেন শেল ফুটিয়ে দিচ্ছে। ফিরতি পথের যাত্রীরা উৎসাহ দিয়ে বলে, বেশী দূরে নেই রামওয়াড়া চটি। এগিয়ে যাও ভাই সব।

ক্লান্ত শরীর আর বুঝি পারে না এগিয়ে যেতে।

নন্দগোপালবাবু বললেন, ও মশাই, সামনে না কি এ রকম বরফ অনেক জায়গায়। আমাদের পথের ওপর এ রকম বরফ বিছানো থাকলে পা পিছলে পড়ে যাবো যে। মাকে নিয়ে যাব কি করে।

রাস্তায় বরফ পাবো কি না জানি না, তবে আমার তো এখন থেকেই কাঁপুনী লাগছে। চলুন, বাবা ৺কেদারনাথ ঠিক নিয়ে যাবেন আমাদের—জবাব দিলাম।

ওঁর মা বললেন, ঠিক বলেছ বাবা। বিচারবুদ্ধি সব সঁপে দাও তাঁকে। নিজেকে দয়াময়ের কাছে সমর্পণ করে দিতে পারলে তাঁর দয়া নিশ্চয়ই হবে, একথা ঠাকুরই বলেছেন।

অহংকে মুছে ফেলতে হবে। আত্মবিসর্জ্জনেই আনন্দস্বরূপ আত্মার মুক্তি। আত্ম অর্থে অহং। বস্তুতান্ত্রিক জগতে আমরা আমিত্বটাকে বড় করে দেখি। অহং যেখানে প্রবল, সেখানে মোহজালে জড়িত আমরা। মোহ যদিও প্রেমের পূর্বলক্ষণ, তা বলে আমিত্বের মোহ কাম্য নয় কভু। আমিত্ব নিয়ে ডুবে থাকলে কেমন করে পৌঁছুব অনন্ত সৌন্দর্যময় প্রেমের রাজ্যে, আনন্দের অমৃতলোকে।

রামওয়াড়া পৌঁছুবার আগেই বৃষ্টি নেমে এল। বর্ষাতি, ছাতা, টুপীতে নিজেদের বেশ করে আচ্ছাদিত করে নিই। পেছনে তাকিয়ে দেখি দুটো মূর্ত্তি ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে। দুজনে কাছাকাছি, একটু বেপরোয়া। সুখী দম্পতি সন্দেহ নেই। মূর্ত্তি দুটো কাছে আসতে দেখি গুজরাটিদের আরও অনেকে আছেন ওদের পেছনে। পা চালিয়ে এগিয়ে চলি। এই দম্পতীকে আরও কয়েকবার এভাবে দেখা গেছে।

একটি সুন্দর ঝরণা, জল অনেক উঁচু থেকে নীচে নেমে এসেছে—সমস্ত দৃশ্যটা নয়নমুগ্ধকর।

ধীরু বললে, এত ভারী যন্ত্রটাকে কি মিছেই ঘাড়ে বয়ে নিয়ে বেড়াব। দাঁড়াও সবাই সারি দিয়ে।

তারপর আমরা দাঁড়াতেই চলে ওর কেরামতি। অসীম সৌন্দর্যকে ক্ষণিকের মায়া দিয়ে বেঁধে রাখতে চায় সে। শিল্পীর চোখ দিয়ে দুনিয়াটাকে সবাই যদি দেখতে পারত!

গুরুজী বললে, ঠিক এরই পাশে কল্পনা কর, কলকাতার ঘিঞ্জী বস্তী। রাস্তার কলে বালতীর লাইন।

চট্টি চ্যাটার্জী বললে, ধ্যেৎ, দিলে পোজটা মাটি করে।

ওর কথায় হেসে ওঠে সবাই। সঙ্গে সঙ্গে ক্লিক করে ওঠে ক্যামেরা। সত্যিই, স্বতঃস্ফূর্ত হাসির আলোয় সমুজ্জ্বল মুখচ্ছবিটা হাজার পোজ মারলেও দেখা যায় না চট করে।

সত্যিসত্যিই বরফ পেলাম পথের ওপর। প্রায় এক ফার্লং রাস্তা বরফে ঢেকে গেছে। হাতের গ্লাভস্ খুলে ফেলে খাবলা খাবলা করে তুলে নিই বরফ। ঠাণ্ডা কনকন করছে, তবু স্পর্শনের আনন্দে আত্মহারা হই।

পি. ডবলিউ. ডি'র লোক দাঁড়িয়ে আছে চামচ নিয়ে—লোহার বড় বড় চামচ। পথের ওপর থেকে বরফ সরিয়ে নিয়ে যাত্রীদের জন্যে রাস্তা পরিষ্কার করে দিচ্ছে। খুব সাবধানে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করতে করতে পা টিপে টিপে পেরিয়ে আসি সে পথটুকু নন্দগোপাল বাবুর মায়ের সঙ্গে। জয় বাবা ৺কেদারনাথ।

রামওয়াড়ায় রাত্রিবাস। ন' হাজার ফিট ওপরে উঠে এসেছি। বৃষ্টিটা ধরেনি, ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে সমানে। পা টিপে টিপে যাওয়া আসা করতে হচ্ছে। সব কটা চটিই যাত্রীদের ভীড়ে গম গম করছে।

আমাদের আস্তানার সামনেই ঘোড়াগুলিকে রেখেছে। চটির ঘর থেকে দেখা যাচ্ছে ওদের। ওদের গায়ে কিছুই নেই; এই শীতে সারারাত এমনি করেই কাটাবে নাকি? ঘোড়াওয়ালাদের একজনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করি সে কথা। ম্লান হাসি হেসে সে জানায় যে নিজেদেরই পোষাকের ওই ছিরি, ঘোড়ার গায়ে চট বা কোন আচ্ছাদন

কেমন করে দেবে। আরও জানায়, পাহাড়ী ঘোড়ার জান বড় শক্ত। ওরা বড় সহিষ্ণু।

সন্ধ্যের পরেই খাওয়াদাওয়ার পাট চুকিয়ে নিই।

পিংখাড়ু পাশের চটিতে চটিওয়ালার সঙ্গে হিন্দীতে আলাপ জমিয়েছে। চটিওয়ালা খাতির করে ওকে উনুনের ধারে বসতে দিয়েছে।

থীরু ডেকে নিলে তাকে, ওহে অনেকক্ষণ তো গা গরম করলেন, এবার শুয়ে পড়ুন।

ওদিকে রসগোল্লাদা, বঙ্কুদা, বি. বি. সি, জন গিলপিন, কারও মুখে কোন কথা নেই। কথা ফুটবে কি করে, যা শীত, বাবাঃ।

শুতে গিয়ে দেখি বালিশ বিছানা সব কনকন করছে। পাণ্ডার কাছে লেপ চেয়ে নেওয়া হল। আমি তো দুটো লেপ নিলাম। একটা লেপ মেঝেয় পাতা হল। তারপর আমার বেডিং বিছিয়ে নিজের লেপ কম্বল গায়ে দিয়ে, তার ওপর পাণ্ডার আর একটা লেপ চাপা দিয়ে নিশ্চিন্ত হই। একটা দুটো করে লেপ অনেকেই নিলেন। উঃ কি শীত, কষে গাও গীত। এই ঠাণ্ডায় আর গীত গায় না। সান্ধ্য কীর্ত্তনের আসর আপাতত বন্ধ।

এলাহাবাদের পিসীমা অনেক তীর্থ ঘুরেছেন। শুয়ে শুয়ে সেই গল্প করেন। কম্বলের ভেতর থেকে হ্যাঁ হুঁ শব্দ করে শ্রোতার অস্তিত্ব প্রমাণ করেন কেউ কেউ।

চটির ঠিক পেছন দিয়ে একটি ঝরণা ঝির ঝির করে বয়ে চলেছে। তার অবিশ্রান্ত ধারার শব্দে কেমন যেন একটা ছন্দ। পথশ্রমে ওর ক্লান্তি নেই, আমাদের আছে। তাই ঘুমোবার চেষ্টা করি। দুর্যোগময় রাত্রিতে ঘুম বুঝি আসে না। কাল সকালে পৌঁছে যাব কেদারনাথে। যাঁর জন্যে শরীরের এত নিগ্রহ, তিনি তো আর বেশী দূরে নেই। কি দেখব সেখানে গিয়ে! ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ি। বৃষ্টির শব্দ,

ঝরণাধারার শব্দ, ঘোড়ার চিঁহি চিঁহি ডাক, সব মিলিয়ে যায় অতলান্তে।

ভোর হল। বেশ বেলা পর্য্যন্ত শুয়ে থাকি বিছানায়। অবসাদ যেন কাটতে চায় না। রাত্রে শুতে যাবার আগে ভেবেছি কখন যে গিয়ে পৌছুব। এখন আর সে ব্যস্ততা নেই, সে চাঞ্চল্য নেই। ভাবি কি হবে তাড়াতাড়ি গিয়ে সেখানে। তিন মাইল পথ দেখতে দেখতে পৌছে যাব।

সকলের মুখে এক কথা, 'ভীষণ চড়াই'। হোক না চড়াই, আস্তে আস্তে যাব। মনকে প্রস্তুত করি। যে চড়াই দেখে হৃৎকম্প হয়, সেই চড়াই পার হতে কিন্তু আনন্দ আছে।

শুয়ে থাকতে দেখে গুরুজী বললে, আর দুটো লেপ দোব না কি।

যে পাশ ফিরে শুয়েছিলাম, সেই ভাবেই জবাব দিলাম, বিশ্বাস কর, পাণ্ডার লেপ টাচ্ করিনি আমি।

যে ভাবে পাণ্ডার লেপের মধ্যে নিজেকে স্যাণ্ডউইচ করলে, তা তো দেখেছি।

দুর্যোগের মেঘ কেটে গিয়ে আকাশ পরিস্কার হয়ে গেছে। দূরে বরফ ঢাকা পাহাড়ের চূড়োয় রোদের খেলা। আলোর বন্যায় হাসে পৃথিবী। দিগন্তের কোল থেকে মাথা উঁচু করা পাহাড়কে ডেকে বুঝি বলেন সূর্য্যদেব, আর ঘুমিয়ে থেকো না। এই নাও, আমি দিলাম স্নিগ্ধ তেজ, মোহময় আলোর ছটা। ডেকে দাও তোমার কোলে আছে যারা। ওই দেখ, ঘন বনানীর ফাঁক দিয়ে ঘুমঘুম চোখে আকাশ ছোঁয়া দৃষ্টি দিয়ে আমার পানে চেয়ে আছে ঘাসফুল, উপত্যকার আড়াল থেকে মিটিমিটি উঁকি দিচ্ছে জমাট বরফের স্তূপ; ও যে স্রোতস্বিনী হয়ে যেতে চায় অভিসারে ওই সমতলাভিমুখে। ওঠ, জাগো, জাগিয়ে দাও এদের সবাইকে।

আঃ কত আলো!

'ম' বাবু বললেন, রোদ উঠেছে বটে, তবে আবার বৃষ্টি হতে পারে। বাক্স বিছানা ভাল করে বাঁধা হয় যেন। রাস্তায় কোন আশ্রয় পাবেন না। এই রাস্তাটুকুতে যেতে বৃষ্টি পাননি, এমন যাত্রী বিরল।

সেই ভাবেই প্রস্তুত হই আমরা। হাঁটুর ব্যথা কমে গেছে। আমাদেরই উঠতে দেরী হয়েছে, নয়ত অন্যান্য সবাই রেডী হয়েছেন রওনা হবার জন্যে।

এত ঠাণ্ডা যে জল গরম হতে চায় না কিছুতে। যাই হোক, গরম গরম খিচুড়ী ভালই লাগল। ক্ষুন্নিবৃত্তি শেষে 'জয় কেদার' বলে রওনা হই আমরা এ পথের শেষ চটি, মহাপথের অন্তিমে তুষারতীর্থ মৌন-গম্ভীর কেদারনাথের পথে। গুরুজীর 'চল বেটা' ডাক আর থীরুর মাউথ অর্গান যাত্রার সঙ্কেত দেয়।

সন্তর্পণে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে যেতে হয়। ফিরতি পথের যাত্রীরা হাসতে হাসতে নামছেন দুপদাপ করে। দামাল ছেলেরা বুঝি পৃথিবী জয় করে ফিরল। থোড়াসা দূর হ্যায়, এই তো পৌঁছে গেছ, এমনি-ধারা উৎসাহ বাণী আমাদের প্রতি। এ পথে ধুলো নেই বললেই চলে ; পাথরের চাঁই বসানো মোটামুটি বাঁধানো রাস্তা ধরে চলি আমরা। 'ম' বাবু ঠিকই বলেছেন, কোন সেল্‌টার নেই, নেই কোন বিটপী শ্রেণী। দু পাশে তুষার সমাচ্ছন্ন পাহাড়, মধ্যে দিয়ে গেছে পথ। নীচে মন্দাকিনী। সৌন্দর্যেভরা এক রঙীন রাজ্যে আমাদের আনাগোনা।

অনেকটা পথ এগিয়ে এসেছি। যে কথা কেউ মুখফুটে বলছে না, অনুচ্চারিত সেই কথাটা যা প্রত্যেকের মনের মধ্যে বার বার উঁকি মারছে, সেটা হচ্ছে, 'পথ আর কত দূর'। একটা একটা করে বাঁক পার হচ্ছি আর ভাবছি এবার বুঝি নয়নগোচর হবে নয়নাভিরামের মন্দিরতীর্থ। কিন্তু কই, পথ যে ফুরোতেই চায় না। পুল পার হয়ে তবে তো মন্দির, কিন্তু কোথায় পুল।

একটি ছোট ছেলে ভিক্ষা চাইল। দেখলে মনে হয় তার বয়স

তিন কি চার। কিন্তু শুনলাম, ছেলেটির বয়স বার। বাড় নেই। অন্যান্য প্রদেশের যাত্রীদের সঙ্গে আমরাও তাকে কিছু দিয়ে এগিয়ে যাই। পাঞ্জাবীদের বউ গল্প জুড়ে দিয়েছে রাজস্থানীদের শ্বাশুড়ীর সঙ্গে। মাদ্রাজীদের মামা বিহারীদের ভাগ্নের সঙ্গে রসিকতা জুড়ে দেয়।

আকাশ অন্ধকার করে এল। দিনমণি মুখ লুকোল ক্ষণকালের জন্য। দেখতে দেখতে টুপটাপ বৃষ্টি নেমে এল। পথের ওপর বরফের টুকরো পড়তে লাগল টাপুস টুপুস করে সাদা সাদা মার্ব্বেল গুলির মত। ছাতার ওপর, হাতে, পায়ে সর্বত্র।

কিছুদিন আগে কলকাতায় 'হলিডে অন আইস' মার্কিন নৃত্য-প্রদর্শনীতে দর্শক হয়েছিলাম। এবারে আর দর্শক নই। বরফের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলেছি। শুধু বৃষ্টি নয়, সঙ্গে প্রচণ্ড ঘূর্ণীবাত্যা বাধাহীন গতিতে নৃত্য করছে। গরম জামা ভেদ করে গায়ে ঠাণ্ডা শলাকা ঢুকিয়ে দিচ্ছে যেন কেউ। সারা শরীর শীতে ঠকঠক করে কাঁপছে।

হাসিমুখে চলেছি এ সব সহ্য করে। ঠাকুর পরীক্ষা করছেন আমাদের ; এ পরীক্ষায় যে জয়ী হতেই হবে। ডাহা ভিজে গেছি, শীতে কাঁপুনী ধরেছে, তবু চলেছি বরফের গোলা খেতে খেতে।

ডাণ্ডীওলারা ডাণ্ডী নামিয়ে বর্ষাতি চাপা দিয়ে বসে আছে সবাই জড়সড় হয়ে পথের পাশে ডাণ্ডীকে ঘিরে। ঘোড়াওলারা সওয়ারী নামিয়ে দিয়ে চুপটি করে বসে আছে ঘোড়াকে আড়াল করে। কাণ্ডী থেকে নেমে এসেছে যাত্রী, কাণ্ডী উলটিয়ে যাত্রীর ওপর ধরে আছে কাণ্ডীওলা। অপূর্ব সে দৃশ্য। আর আমরা, পা দুখানির ভরসায় যারা এতটা এসেছি, তারা চলেছি সমস্ত ঝড়ঝাপ্টা মাথায় পেতে নিয়ে।

ডাণ্ডীওলা বললে, ঠাহর জাইয়ে শেঠ।

কেঁও ?

পানী বড়া জোর মালুম হোতা।

হোনে দেও ভাই, আভি তো পঁহুচ গিয়া—বলে এগিয়ে চলি।

ঐ তো দূরে মন্দাকিনীর পুল দেখা যাচ্ছে। সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে সেই উপত্যকা প্রান্তরে চীৎকার করে বলে উঠি, জয় ৺কেদারনাথ জী কি জয়।

যাদের কানে পেঁাছোয় সে ডাক, আকুল প্রণতি সেও জানায় 'জয় কেদার' বলে। ওই তো ঐ স্বর্ণমণ্ডিত মন্দিরের চূড়ো দেখা যাচ্ছে। হঁ্যা, হঁ্যা, কোন ভুল নেই। কতবার ছবিতে দেখেছি ঐ মন্দির। বরফের আসনে ৺কেদারনাথকে বুকে নিয়ে বছরের পর বছর বসে আছে স্থির হয়ে। শীতে সারা অঙ্গে শ্বেতবাস, তবু প্রকাশ করে না আর্তি। সম্মুখে, পশ্চাতে যে দিকে তাকাও, সে দিকেই দেখ কেবল চোখ ধঁাধানো বরফ। এ কোথায় এলাম, এটা কোন ঋতু।

আর ভাবনা নয়, কেবল এগিয়ে চল। পদযুগলই এখন সম্পদ। বৃষ্টিটা ধরে গেছে, রাস্তা তবু ভিজে স্যাঁৎসেঁতে। সাবধানে পুল পেরিয়ে এদিকে আসি।

আর একটুখানি পথ। দোকান, ঘর, চটি দেখা যাচ্ছে একটি দুটি করে। অনমুভূত এক আনন্দ নিয়ে এগার হাজার সাতশ পঞ্চাশ ফিট উঁচু কেদারপুরীতে প্রবেশ করি। জয় ৺কেদারনাথ কি জয়!

পৌঁছিয়ে প্রথম কাজ হল, আগুনের তাতে নিজেকে সেঁকে নেওয়া। জুতো, মোজা, জামা, বর্ষাতি সব ভিজে গেছে। আগুনের আংরাটাকে ঘিরে বসেছে সব। হয়ত আমার হাতের ওপর দিয়েই কেউ বাড়িয়ে দিলে ঠ্যাং, আরেকজনের গায়ের ওপর হুমড়ী খেয়ে নিজের শরীরটাকে হেলিয়ে দিলেন কেউ।

মধ্যম পাণ্ডব বললে, আমাকে একটা বড় টোষ্টারে পুরে কেউ যদি সেঁকে দিত!

আমরা হাসলাম ওর কথায়। মড়ার মত ফ্যাকাশে হাসি। নার্ভটা এখনও ঠাণ্ডায় জমে রয়েছে, প্রাণখোলা হাসি আসবে কোত্থেকে।
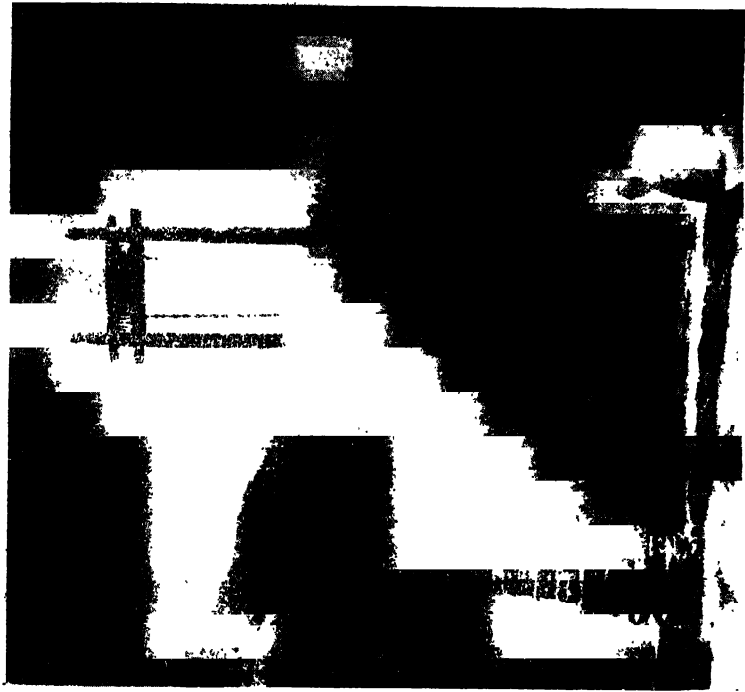
...বরফ পেলাম পথের ওপর—পৃঃ ৫৯

...পাশেই লোহার শেকলে ঝোলানো দোলনা—পৃঃ ৩৯

...নামেই প্রকাশ, এটি নারায়ণের মন্দির—পৃঃ ৮২

.. যাত্রীদের জন্য রাস্তা পরিস্কার করে দিচ্ছে—পৃঃ ৫৯

যাদের শরীর একটু গরম হল, তারা চলল লেপের নীচে; আজ আর খাওয়াদাওয়া সেরেই সঙ্গে সঙ্গে অমনি ছোটবার বালাই নেই।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে এলেন শিবপুরের মামীমা। কাণ্ডীতে চাপবার সময় পড়ে গেছেন। মালিশ করে দেওয়ার পর একটু আরাম বোধ করলেন তিনি। এলাহাবাদের পিসীমা, মুক্তোদাদা, বৌরাণী, মুক্তি-বৌদি, শিলঙের মেজদার মা, দিদিমণি, রাঙাদি আরও অনেকে চললেন ধূলোপায়ে দেবদর্শন করতে।

আমার নড়বার ক্ষমতা নেই। আমি নট নড়নচড়ন। বেশ খানিকক্ষণ শবাসনে শুয়ে থাকবার পর একটু যেন বল পেলাম শরীরে।

কুলীরা এসে পড়ল একজন একজন করে। বিছানার গায়ে জড়ানো রবার ক্লথ থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরছে।

কুলীদের চোখে জল নেই। এই দুর্গম দুরূহ পথে এতটা ওজনের মোট বহন করতে হচ্ছে বলে ক্ষোভ নেই ওদের। ওরা অদৃষ্টকে ধিক্কার দেয় কি না জানি না, তবে এই অত উঁচু চটিতে আমার বিছানা আমার ঘরে পেঁীছে দিয়ে আমার দিনরাত্রির আরামের ব্যবস্থা করে দিয়ে গেল যে লোকটা, তার কাজের পারিশ্রমিক হিসেবে কতটুকু দিয়েছি তাকে?

আমার মুখে হাসি দেখে দরজার কাছে পা বাড়ায় সে হাসিমুখে। এরা লেখাপড়া জানে না, পৃথিবীর ঘটনাস্রোতের সঙ্গে এদের পরিচয় নেই। কেবল কায়িক পরিশ্রমের যোগ্যতাই জীবিকানির্বাহের অবলম্বন। সরল, বিশ্বাসী ও কষ্টসহিষ্ণু এই জাতটা দু'বেলা পেট ভরে খেতে পায় না, দুটো ভাল জামাকাপড় পরতে পায় না। অথচ ওদের না হলে এ পথে এক পা অগ্রসর হওয়ার চিন্তা করাও বাতুলতা।

জং বাহাদুর—

আমার ডাকে দোর থেকে ফিরে তাকায় সে। মণিব্যাগ থেকে একটা টাকা দিলাম তাকে। সেলাম করে চলে গেল মুখের হাসির রেশ বজায় রেখে।

জিনিষপত্র গুছিয়ে নেবার পর আর চারজন পাণ্ডবের সঙ্গে চললাম মন্দির দেখতে। ছোট দোকান, পোষ্টাফিস আর পাণ্ডাদের বাড়ীর পাশ দিয়ে ঘুরে ঘুরে মন্দিরের রাস্তা। সবটাই পাথর বসানো। জায়গায় জায়গায় বরফ জমে উঁচু হয়ে আছে। যাবার পথে পোষ্টাফিস থেকে বাড়ীতে টেলিগ্রাম করে দিই।

অনেকখানি সমতল জায়গা জুড়ে মন্দিরের অবস্থিতি। সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে উঠতেই প্রথমে চোখে পড়ে একটি পাথরের বৃষ। আকারে খুব বড় নয়। দক্ষিণ ভারত পরিক্রমায় রামেশ্বর মন্দিরে ও সুচীন্দ্রম মন্দিরে যে প্রকাণ্ড বৃষ দেখেছি, সে অনুপাতে বেশ ছোট।

সুমিষ্ট যুগ্ম কণ্ঠের মহেশ্বর স্তোত্রাবলী কানে এল। চেয়ে দেখি প্রশস্ত চত্বরের এক কোণে জাহাঙ্গীর ও নুরজাহান। মনোরম পরিবেশে ভারী ভাল লাগল ওঁদের আবৃত্তি। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে শুনলাম কিছুক্ষণ।

থীরু বললে, তানসেন, তোমার গুলি কিছু এবার ছাড়ো। সারা রাস্তা প্রলোভন দেখিয়েছ।

পিংখাড়ু বললেন, জমে গেল যে রক্ত।

জবাব দিই আমি, পরে পাবে। আপাতত গুলিও জমে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। এ্যাকসন হবে না।

তা হলে তুমি একাই খেও। যে রকম শুয়েছিলে, শবাসন না শব বোঝা যাচ্ছিল না—বললে গুরুজী।

দরজার মুখেই বৌরাণীদের সঙ্গে দেখা। ওঁরা দর্শন সেরে বেরিয়ে আসছেন পরিতৃপ্তির হাসি নিয়ে। আমরা প্রবেশ করি মন্দিরের ভেতর।

সামনেই যে প্রকোষ্ঠ, তার চারপাশে পঞ্চপাণ্ডব যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও লক্ষ্মীর মূর্ত্তি। এক একটি ছোট ছোট খুপরীর মধ্যে এক একটি মূর্ত্তি। গরুড় মূর্ত্তি, গণেশ মূর্ত্তি রয়েছে একপাশে।

আবার সিঁড়ি পেরিয়ে মূল মন্দির। ছোট দরজায় মাথা নীচু করে ঢুকতে হয়। অপরিসর ঘর। শ্বেত পাথরের মেঝের মাঝখানে অচঞ্চল মৌনী ৺কেদারনাথ। মূর্ত্তি নয়, একটি পাথরের স্তূপ। বিগ্রহকে ঘিরে ছোট একটি পথে গালিচা পাতা। ঘি আর গঙ্গাজলে ভিজে জবজবে হয়ে উঠেছে। খালি পায়ে যেন ছুঁচ বিঁধছে। প্রদক্ষিণ করি আমরা যুক্ত করে। কুলুঙ্গীতে জ্বলছে ঘিয়ের প্রদীপ, অখণ্ড জ্যোতি।

এরই জন্যে এত। এই ৺কেদারনাথ। দেহের ওপর দিয়ে এত যে পীড়ন, অশান্ত হৃদয়ে এত যে আশা আকাঙ্ক্ষার দহন, তা বুঝি এতদিনে শেষ হল। পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদীর সঙ্গে যেখানে তপস্যা করেছিলেন, সেখানে দেহধারণ করলে শিবরূপ প্রাপ্ত হয় মানুষ।

প্রতি যাত্রীর মধ্যে আমি দেখেছি আন্তরিক পরিতৃপ্তি। মহাবিশ্বের উদার অঙ্গনে এসে ভক্ত চাইছে নিরাভরণ ঋজুতায় নিজেকে সঁপে দিতে দেবমহিমার বেদীমূলে। যিনি থাকেন দূরে তাঁকে কাছে পাওয়ার আনন্দ ঢেকে রাখতে পারে না মানুষ। 'দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা' তা বুঝি এইখানেই।

এই তীর্থ কত শতাব্দী ধরে ধনী, দরিদ্র, জ্ঞানী, মূর্খ নির্বিশেষে কত মানুষ, কত যাত্রীকে আপনার কোলে টেনে এনেছে, কত জাতের কত মানুষ এই পথে এসে এক হয়ে গেছে অপরের মধ্যে নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পেয়ে। ধ্যানের দেবতা ইনি তো শুধু প্রস্তর নন, ইনি অন্তর্যামী। অন্তর্যামী না হলে কেমন করে টের পেলেন আমার মনের ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষাটি, আর অমনি টেনে নিয়ে এলেন তাঁর পায়ের কাছে।

বেশীক্ষণ খালি পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা কষ্টকর। ঠাণ্ডায় পায়ের কনকনানি মাথায় ওঠে। অবশ হয় দেহ, অবশ হয় না মন। তাঁকে যদি নির্জনে পেলাম অনন্তকাল হতে অবিস্মরণীয় কিছুক্ষণের জন্য সেকি বৃথাই যাবে!

গুরুজী তন্ময় হয়ে দেখছে। থীরু, চট্টি চ্যাটার্জী, মধ্যম পাণ্ডব কারও মুখে কোন কথা নেই।

কি ভাবছ, তানসেন—থীরু নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে।

বিজ্ঞানের ছাত্র আমি, তবু জড়বাদী নই। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে জবাব দিই, ভেবে দেখ. নির্জন এই দেবালয়কে ঘিরে যত অতীত কাহিনী প্রচলিত, বিশ্লেষণ করলে, এর মধ্যে থেকেই খুঁজে পাওয়া যাবে আমাদের সত্যিকারের পরিচয়।

ইউ সিম টু বি আণ্ডার এ স্পেল। তুমি দেখছি ভাবে বিভোর হয়েছ। চল খাবে চল।

ঠাট্টা করছ। এই সত্যই স্থায়ী হবে জেনো।

তুমি না ট্যুরিষ্ট ?

এবং তীর্থযাত্রীও বটে—জবাব দিয়ে বেরিয়ে আসি মন্দির থেকে।

আর এক পশলা বৃষ্টি মাথায় করে চটিতে ফিরি। আবার পায়ে ছুঁচ বেঁধানো যন্ত্রণা।

খাওয়াদাওয়ার পর দল বেঁধে বেরিয়ে পড়তে হল। মনের আনন্দে মাউথ অর্গান বাজায় থীরু।

গুরুজী বললে, চলো আগে ফলাহারী বাবার কাছে যাই।

সেখানে যেতে যেতে পথের মাঝখানে থমকে দাঁড়িয়ে চতুর্দ্দিকে তাকাই। 'হিমালয় বুকে' প্রসাধন সামগ্রীর বিভিন্ন আধারের গায়ে, কৌটোতে, বাক্সে যে ছবি আঁকা থাকে, তাকে যেন ব্যঙ্গ করছে এখানকার প্রকৃতির একাংশ। ছবি নয়, জলজ্যান্ত আস্ত পাহাড়। মনে হয়, পাহাড়, নদী, ঝরণা আর বনানীশ্রেণী কে যেন ছবির মত সাজিয়ে রেখেছে থরে থরে এ ধরণীর বুকে। যেমনটি দেখতে চায় মন, ঠিক তেমনটি। নিসর্গপ্রীতি আছে আমাদের সকলের মধ্যে, তাই তৃপ্ত হয় মন এ দৃশ্যে।

আমাদের পিছু পিছু এলেন অনেকে। বোষ্টমাসী, রসগোল্লাদা, নীলগেঞ্জী, বি. বি. সি ফিরলেন ওদিক থেকেই।

ছোট্ট ঘরের ছোট্ট ওই মানুষ কিসের জোরে আমাদের কাছে দর্শনীয় হয়ে ওঠেন বুঝতে পারি। শুনলাম, উনি সিদ্ধ পুরুষ। খাদ্যের মধ্যে ফল। বেশ করে তাকিয়ে দেখি তাঁর দিকে। প্রসন্ন বদনে স্মিত হাসি তাঁর। চুল দাড়ি পক্কতায় শুভ্র। এতদিনে সত্যিই একজন যথার্থ সাধুর দর্শন পেলাম। অল্পায়াসে ছবি তোলার অনুমতি পাওয়া গেল। তাঁর বাণী শুনলাম শ্রদ্ধাবনত চিত্তে। সাধন মার্গ, ভক্তি মার্গের কথা শুনি, তারপর প্রণাম জানিয়ে উঠে আসি একসময়।

কাল মন্দিরে পূজোর ব্যাপারে ব্যস্ত থাকব, তাই আজই ঘুরে ঘুরে দেখে নিই সব। চলল কুণ্ড পরিক্রমা। উদককুণ্ড, হংসকুণ্ড ও রেতকুণ্ড।

ঘুরতে ঘুরতে এলাম শঙ্করাচার্য্যের সমাধি ক্ষেত্রে। সমাধি ক্ষেত্র সুরক্ষিত নয়। বিষণ্ণ হয় মন, এমন মহাপুরুষের সমাধির এই অবস্থা দেখে। আমরা কি কিছুই করতে পারি না এ বিষয়ে! ইউ পি সরকারের কি কোন দায়িত্ব নেই?

পাণ্ডা সঙ্গেই আছে। স্থান পরিচিতি করিয়ে দিতে থাকে সে। মন্দিরের পাশ দিয়ে একটা রাস্তা সর্পিলভাবে ঘুরে ঘুরে চলে গেছে যে পাহাড়ের দিকে ওখানে আছেন ভৈরব লিঙ্গ। বাম দিকে মন্দাকিনী প্রপাত। হিমহ্রদ আছে দুটি। বাসুকীতাল ও চোরাবারি। হিমের হ্রদ না বলে বরফের সমুদ্র বলাই ভাল।

রসগোল্লাদা বললেন, ভীষণ ঠাণ্ডা, নয়ত সব ঘুরে আসা যেত। কি বলেন?

বঙ্কুদা বললেন, ঠিক বলেছেন।

নীলগেঞ্জী বললেন, চেপে যাও বঙ্কুদা।

চতুর্দ্দিকে বরফ। জুতো ভিজে ঢোল, স্যাঁতস্যাঁত করছে মোজা, তবু আমরা পা পা করে চলতে সুরু করেছি সেই বরফের ওপর দিয়ে। দু'বার পা হড়কে গেল। সামলাতে না পেরে দু হাত সামনে দিয়ে ব্যালান্স ঠিক করি আর ব্যালান্স ঠিক করতে গিয়ে গ্লাভস্ গেল

ভিজে। গায়ের বরফ ঝেড়ে ফেলে দিতে গিয়ে থীরুর হাতে বরফ লেগে গেল।

গুরুজী বললে, তানসেন, ক্যামেরাটা সামলাও।

চতুর্দ্দিকে জলধারা। কোনটা যে নদী আর কোনটা ঝরণা বোঝা দায়। ছবি তোলা হল অনেকগুলি। আমাদের কাছে মুভী ক্যামেরা ছিল না, তাই আফশোষ হচ্ছিল। সুদূর নীলিমাপ্রসৃত ওই বরফের চুড়ো ঘেরা মন্দিরের ওই একটুখানি জায়গায় চিন্তাহীনভাবে ঘোরাফেরা করতে করতে মনে হচ্ছিল বসুমতী কত সুন্দর। হায়, এই সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ ছেড়ে কালই আমাদের চলে যেতে হবে!

আবার মেঘ করে এল। এই রোদ, এই মেঘ। আলো ঝলমল পৃথ্বী নিমেষে তমসাচ্ছন্ন হয়. আবার তমসা কেটে গেলে ঝলমলিয়ে ওঠে।

বেড়াতে এসেছি, তা বলে জলে ভিজে রোগকে সঙ্গী করতে নয়। দৌড়, দৌড়, দৌড়—একটা একতলা ঘরে এসে আশ্রয় নিই। কাদের ঘর কে জানে, লোকজন কেউ নেই।

জল থামতে চলি দোকান পানে। দোকানী সমাদরে বসতে বলে। মেঝেয় বসতেই ছ্যাঁক করে ওঠে গা। কার্পেট তুলে দেখি নীচে বরফ আছে নাকি। না নেই। জামার বোতাম, ছাতার হ্যাণ্ডেল ইতিমধ্যে কনকনিয়ে গেছে। কিছু ছবি কেনা হল আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, প্রিয়পরিজনের জন্য। কিছু না কিছু কিনে নিয়ে না গেলে যাত্রা না কি সফল হয় না।

ঘুরতে ঘুরতে বিকেল হয়ে গেল। মন্দিরে সন্ধ্যারতি দেখতে হবে। চটিতে ফিরে এসে গায়ে গরম জামাকাপড় চাপিয়ে গরম চা দুধ খেয়ে নিই সবাই। যাঁরা এতক্ষণ লেপের নীচে বসে শরীর গরম করছিলেন, তাঁদের আর কৌতুহল নিরসন করা যায় না কিছুতেই।

শিবপুরের মামীমা বললেন, ছবি তুলেছ তো বাবা। ফিরে গিয়ে দেখিও।

এম. পি. বললেন, থীরুবাবুর ছবি আর আপনার লেখা আমাদের না-দেখার অংশ পূরণ করবে আশা করি।

জবাব দিলাম, কতটা করবে জানি না, তবে যদি তাতেও কিছু বাকী থেকে যায়, বাকীটা পূরণ করবেন আপনাদের কল্পনা দিয়ে।

এম. পি. হাসলেন।

আরতি দেখতে যাবেন অনেকে। বৌরাণী, মুক্তিবৌদি, রাঙাদি, এলাহাবাদের পিসিমা, দিদিমণি, জাহাঙ্গীর, চার্লি চ্যাপলিন, মুক্তো-দাদা বেশ করে গরমজামায় আচ্ছাদিত করেন নিজেদের। পাণ্ডা পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় সকলকে। জ্যোৎস্নায় প্লাবিত ধরণী। চলেছি মন্দিরে।

যদি কেউ জানতে চান এখানে কি আছে, বলব, ঠাণ্ডা আছে। দার্জিলিং, মুসৌরীতে যাঁরা থাকেন, তাঁরা কলকাতার লোককে গরমের স্যুট পরতে দেখে যেমন নাক উঁচিয়ে বলতে পারেন, এ আর কি শীত !, তেমনি কেদারনাথের লোকেও গরম জামার বাহার দেখাতে ম্যাল-এ যান যাঁরা, তাঁদের বলতে পারেন, ওখানে আবার ঠাণ্ডা নাকি !

শুধু চোখ দুটো খুলে রেখে সর্ব্বাঙ্গ চাপা দিয়ে কয়েকটি প্রাণী আরতি দেখে ফিরে এসে, কিছু গলাধঃকরণ করে, ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে সেই যে শুয়ে পড়ি, উঠি পরদিন সকালে।

পরিস্কার আকাশ। রৌদ্রকরে স্নান করে আমরা তপ্ত করি দেহ। সত্যি কথা বলতে কি, ঠাণ্ডায় রাত্রিতে ভাল ঘুম হয়নি। গালিব সারারাত কেশেছেন। মাথা ভার হয়েছিল অনেকেরই।

খদ্দরের সার্ট বললেন, ভগবান এমন একটা অদৃশ্য রেফ্রিজারেটার এখানে বসিয়েছেন যে তার ভেতর লোকজন, বাড়ীঘর, সব একেবারে হিমের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

যাঁদের ইচ্ছে ছিল এখানে তিনরাত্রি বাস করবেন, তাঁরা প্রকাশ্যে

বলতে লাগলেন আজই দিনে দিনে রওনা হবার জন্যে। বাবাঃ, যা শীত!

'ম' বাবু বললেন, কি করি বলুন তো মশাই।

যুক্তি নেবার জন্যে আবার তিনি পঞ্চপাণ্ডবের কাছে আসেন।

গুরুজী বললেন, ভোট নেওয়া হোক।

থীরু বললে, মেজরিটি মাষ্ট বি গ্রাণ্টেড।

ভোট গ্রহণ শেষ হবার আগেই পাণ্ডা তাড়া দেয় মন্দিরে যাবার জন্যে।

অত শীত, তবু বোষ্টমাসী হুড়হুড় করে জল ঢেলে স্নান সেরে নিলেন। বেশীর ভাগ যাত্রীই কিন্তু স্নানের আর নাম করছেন না। এত কষ্ট করে বয়ে নিয়ে আসা ভাল ভাল কাপড় জামা বার করলেন কেউ কেউ বাক্স পেঁটরা থেকে। গরদের শাড়ী, সিল্কের কাপড়, উড়্‌নী, আরও কত কি!

বেশ খানিকটা নীচে নেমে মন্দাকিনী থেকে ঘটি ভর্তি জল নিয়ে আসি। সেই জল মাথায় ছিটিয়ে চললাম মন্দিরে। গুরুজী ও আমি আগে, হাতে পূজোর থালা। পেছনে থীরু ও চট্টি চ্যাটার্জী। মধ্যম পাণ্ডব মাকে নিয়ে ব্যস্ত।

খুব ভীড় ভেতরে। 'কিউ' দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। তারপর একসময় একেবারে গর্ভগৃহের মাঝখানে গিয়ে পড়ি। অঞ্জলি দেবার পর ৺কেদারনাথকে ঘি মালিশ করে আলিঙ্গন করি। এই প্রথা।

আশ্লিষ্ট হতে গিয়ে আলোয়ানটা খুলে গেল। যাক খুলে। সমস্ত মালিন্যের আচ্ছাদন যদি এমনি করে খুলে যেত!

মনের কামনা বাসনা জানাবার জন্যে ব্যাকুল হয় মন। কিন্তু কি চাইব, চাইবার কিই বা আছে। যে পরিবেষ্টনীতে চাওয়ার প্রশ্ন জাগে মনে, সে পরিবেশ কোথায়! সব চাওয়ার এবং পাওয়ার শেষ এখানে। প্রদীপের ঘিয়ের পোড়া গন্ধ, কর্পূরের গন্ধ আর ধূপের গন্ধ আমোদিত এই পবিত্র পুরীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে অতীত ভারতের ঐতিহ্যের ইতিহাস।

কখনও কি স্থির চিত্তে ভেবেছি, তুষারাদ্রিকে ঘিরে শত শত প্রাচীন মন্দিরের অবস্থিতিতে ভারতাত্মা কোন রূপে প্রকাশিত। স্থূল প্রয়োজনের নির্মম প্রসারিত হস্তে অপ্রয়োজনের ছোট্ট কুঠরীতে ফেলে রেখে দিই যাঁকে, প্রাপ্তির বেদনা মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে তাঁরই সঙ্গে একান্ত অন্তরঙ্গ হবার জন্যে।

অন্তর আছে বলেই তো অন্তরঙ্গ। তবু রঙ্গ এই, অন্তরের অন্তহীন ঔদাসীন্যে তুষারমৌলী ধ্যাতা গম্ভীর হিমালয়ের বুকে অটল ৺কেদারনাথের ঘুম ভাঙ্গাবার প্রয়াস নেই। অন্তরের ডাকে সাড়া দেন তিনি। দেবতার অন্তরের সঙ্গে যোগাযোগে যেখানে স্বার্থবুদ্ধি আর বিষয়বুদ্ধিরূপ সমুদ্র বিরাট অন্তর সৃষ্টি করছে, সেখানে কেমন করে সাড়া দেবেন তিনি। আন্তরিকতার পথে অন্তরায়কে দূরে সরিয়ে রাখবার চেষ্টা কই? কই সে নিবিষ্ট মন, কই সে একনিষ্ঠ প্রার্থনা? রূপাতীত তিনি, ব্যঞ্জনাতীত এ রূপ, সাধ্যাতীত এ ব্যঞ্জনা। রূপোর আয়নায় জগতের রূপকে প্রত্যক্ষ করবার চেষ্টা যে মানুষের, সে তো চক্ষুষ্মান হয়েও অন্ধ।

আলোয়ান পড়ে গেছল, সেটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে আসি।

সুফল দেবার জন্যে পাণ্ডারা এগিয়ে এলো। একান্ন টাকা, পঁচিশ টাকা যে সব যাত্রী দিলেন, তাদের ঘটা করে সুফল দেওয়া হল। দশ টাকা বা পাঁচ টাকা প্রণামী দিলেন যাঁরা, তাঁদের বেলায় ততটা ঘটা হল না। না হোক, রফা করে দফায় দফায় সুফল গ্রহণ শেষ হল।

ভারতের নানা তীর্থ পরিক্রমা করেছি। দেখেছি পাণ্ডাদের সহৃদয়তা, দেখেছি তাদের পীড়ন, দেখেছি তাদের আন্তরিকতা, দেখেছি তাচ্ছিল্য ভাব। পাণ্ডাহীন তীর্থ নেই, যাত্রীবর্জিত পাণ্ডাও নেই কোথাও।

রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছেন, আমাদের মনটা কাঁচা ফিল্মের মত। যা কিছু প্রথমে তার আওতায় আসে, সে তাকেই নিজস্ব করে

রেখে দেয়। তারপর চলে মস্তিষ্কের কাজ। সে 'ওয়াশ' করে, বিচার করে, বিশ্লেষণ করে যদি তাকে রাখবার মত মনে করে তবেই সেটা পাকাপাকি মনের কোণে ঠাঁই পায়। পাণ্ডাদের সম্বন্ধে মনের মধ্যে নানারূপ প্রতিক্রিয়া হয় মাঝে মাঝে। কেউ কেউ বিরক্ত হলেও খুশী হয়ে কুমারী পূজোর টাকা দিলেন অনেকে।

ভোটের ফলাফলে এখান থেকে যাওয়াই স্থির হয়েছে। খবর পেয়ে কুলীরা তাগাদা দিতে সুরু করে। বসে থাকলে ওদের লোকসান। মাল হিসেবে পয়সা পাবে, দিন হিসেবে নয়। খাওয়া-দাওয়া সারতে কিছু সময় গেল।

এ বেশ মজা; এত কষ্ট করে এসে আবার পালাই পালাই রব। ঠাকুর বোধহয় অলক্ষ্যে হাসেন আমাদের রকমসকম দেখে।

বটকেষ্ট পোষ্টাফিস থেকে চিঠিপত্র নিয়ে এল। 'ম' বাবুর কেয়ারে চিঠি লিখলে পৌঁছে যায় ডাকের চিঠি। অমনি কাড়াকাড়ি পড়ে গেল চিঠি নিয়ে। সবাই তো আর দারা পুত্র পরিবার সঙ্গে নিয়ে আসেননি, তাই তাদের জন্যে সহজেই উতলা হয় মন।

বোলপুরের শান্তিদিদিকে জিজ্ঞাসা করি, চিঠি এল আপনার?

না আসেনি—সহজ ভাবেই বললেন তিনি।

বুঝলাম মনকে শক্ত করে ফেলেছেন।

একটু পরে বললেন, ঠাকুরপোর তিন জায়গায় লেখা তিনখানা চিঠি এসেছে।

সংসারের ঘূর্ণীপাকে ঘোরে যে মানুষ, এখানে এলেই কি আর সে ঘূর্ণীপাকের কথা ভুলতে পারে। এই চিঠি সে যোগসূত্র রক্ষা করে।

খদ্দরের জামার চিঠি আসেনি।

রাঙাদি বললেন, লোক নেই চিঠি লেখার, চিঠি লিখবে কে?

সিলিক ঠাকুরমা বললেন, তোমরা তো একটা সম্বন্ধ করলেই পার।

হাতযোড় করে বলি, দয়া করে ওটি করবেন না। সম্বন্ধ কারকে

ষষ্ঠী। নিজেই খেতে পান না, এরপর মা ষষ্ঠির কৃপায় ওনারা এলে, স্রেফ শুকিয়ে মরে যাবে।

খদ্দরের জামা কথাপ্রসঙ্গে কয়েকদিন আগে নিজের সম্বন্ধে যা বলেছিলেন, আমি হুবুহু সেই কথা জানাই। কুমারডুবীর শ্রীকুমার আর ডাক্তারবাবু রেডি হয়ে গেছেন। জিনিষপত্র বাঁধাছাঁদার ফাঁকে ফাঁকে এমনি করে গাঁথা হয় টুকরো কথার মালা।

তারপর 'জয় ৺কেদারনাথ কি জয়' ধ্বনি তুলে মন্দিরমুখো হয়ে ৺কেদারনাথে শেষ প্রণাম জানিয়ে রওনা হলাম আমরা। উৎরাই পথে স্নুরু হল ফিরতি পথের যাত্রা।

আকাশ পরিস্কার রয়েছে। মাঝে মাঝে মেঘাচ্ছন্ন হলেও বৃষ্টি নেই। ওঠবার সময় যে কষ্ট পেয়েছি, আজ নামবার সময় সে কথাটা মনে হচ্ছে। আমাদের কষ্টটা কি রকম হয়েছিল, সেটা অনুভব করি এখন উঠতি পথের যাত্রীদের কষ্টক্লান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে। দ্বিগুণ জোরে জয় ৺কেদার বলে তাদের উৎসাহ দিতে দিতে স্পষ্ট দেখতে পাই তখনকার আমাদের পরিশ্রান্ত মুখের চেহারা, যা এখনকার ওদের চেহারায় প্রতিবিম্বিত।

এক একজন দুপদাপ করে নেমে চলেছেন কাণ্ডীকে পাশ কাটিয়ে, ঘোড়াকে পেরিয়ে। কেউ বা চলেছেন ধীরে মন্থর গতিতে। পথ এখন আর নতুন নয়।

পথের প্রান্তে গুহকোটরে সেই সাধু স্মিতহাসি দিয়ে অভ্যর্থনা করেন আমাদের। ঢোল বাজিয়ে অনবরত ৺কেদারনাথের মঙ্গলাশীষ বর্ষিত হবার প্রার্থনাবাণী শোনাচ্ছিল যে যুবা, সে-ও হাসে আমাদের দিকে চেয়ে। জীবনে আর হয়ত কোনদিন ওর সঙ্গে দেখা হবে না। মুখখানা কি মনে থাকবে, না কি ক্রমশ ভুলে যাব!

রামওয়াড়াতে রাত্রিবাস করেছিলাম; এখন দিনের আলোয় তার চেহারা দেখি। এক কাপ চা খেয়ে যাবার সনির্বন্ধ অনুরোধ জানায় চটিওলা। সে যেন অনেক দিনের পরিচিত—অনুরোধ উপেক্ষা করা

যায় না। একটু থমকে বসতে হয়। তার দোকানের সামনে কাঠের তক্তার বেঞ্চিটা হুড়মুড় করে ভেঙ্গে গেল খরিদ্দারের উৎপীড়ন সহ্য করতে না পেরে।

গুরুজী বললে, এটা কি ভাল হল ?

বি. বি. সি বললেন, অত প্রতিপদে ভাল মন্দ বিচারে কাজ কি। কিছু মূল্য ধরে দিলেই হবে।

তাই কি হয় সব সময়ে। চট্টি চ্যাটার্জী পয়সা দিতে গেলে জিভ কেটে চটিওলা বলে, এ কি কথা, ওটা তো ভাঙ্গাই। রোজই ভাঙ্গে, আবার জুড়ে দিলেই হবে। মহারাজ, এদেশে তোমরা মেহমান।

জানি চটিওলার অবস্থা সচ্ছল নয়; তাই বলি, মিছামিছি আমরাই বা কেন ক্ষতি করব তোমার।

শেঠ, ও কথা বলবেন না। আমরা গরীব, দুঃসময়ে আপনাদের কাছে ভিক্ষে করি, তবু অন্যায় করে পয়সা নেব না।

আশ্চর্য্য হলাম ওর কথা শুনে। খানিক আগেই সুফল দেওয়ার ব্যাপারে মনটা একটু বিরূপ হয়েছিল এখানকার লোকেদের প্রতি। কিন্তু না, এখানেও ভাল লোক আছে। ভাল আর মন্দ এই নিয়েই তো জগৎ।

রামওয়াড়া পেছনে পড়ে রইল। গুণগুণ করে গান গাইছেন বৌরাণী, পেছনে কোরাসে রয়েছেন এম. পি. ধীরু আর নীলগেঞ্জী।

গৌরীকুণ্ডর কাছ বরাবর আসতে বৃষ্টি নামল। ঢালু পথে নামা; পা হড়কে যাবার সম্ভাবনাকে বাঁচিয়ে সন্তর্পণে এগিয়ে চলি। খদ্দরের সার্ট, পিংখাড়ু এগিয়ে গেছেন সকলকে ফেলে।

এগিয়ে যাওয়ার নিছক একটা আনন্দ আছে। এ পথে সে আনন্দ পেতে অনেকেরই ইচ্ছে যায়। থাক পড়ে পেছনে সবাই, কারও সঙ্গে গল্প নয়, কোন কিছু চেয়ে দেখা নয়, বিশ্রাম নয়, শুধু লাঠি ঠুকতে ঠুকতে এগিয়ে চলা। আত্মপ্রসাদ লাভ হয় বেশ। কিন্তু এগিয়ে চলবার ইচ্ছেটা স্থায়ী হয় না মনে বেশীক্ষণ। খানিক পরেই নিজেকে

একা মনে হয়। পথের ধারে পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে বসে পেছনের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়—কখন আবার দেখা দেবে কয়েকটি চেনা মুখ।

এরাই ভাই, এরাই বন্ধু, এরাই উপদেষ্টা, এরাই নার্স, এরাই সেবিকা, এরাই আত্মীয়। দূর থেকে এদের কাউকে দেখা গেলে মনটা খুশীতে ভরে ওঠে।

ঘোড়ায় চেপে নামতে অসুবিধে হয়। মুখ থুবড়ে পড়ে যাবার ভয় থাকে। জন গিলপিন, জনি ওয়াকার এদের অবস্থা শোচনীয়।

জন গিলপিনের মুখে এখন আর 'কি দাদা, কি রকম লাগছে' বুলি নেই। প্রাণটাকে ঘোড়ার জিনে বসিয়ে লক্ষ বার রাস্তা ভাল হবার কামনা জানিয়ে চলেছেন তিনি। আমাকে বললেন, একটু আস্তে, দাদা।

আর আস্তে! কে যেন ধাক্কা দিয়ে নামিয়ে দিচ্ছে আমাদের।

এলাহাবাদের পিসিমা বললেন, এখানে একজন পাহারাদার আছেন। বাবার কাছে যারা থাকতে চায় না, তিনি তাদের এমনি করে দূর করে দেন। ধাক্কা মারতে মারতে একেবারে গৌরীকুণ্ডে পাঠিয়ে দেন। সেখানে মতিস্থির করে আবার যদি কেউ উঠে আসে, তখন আর পাহারাদার কিছু বলেন না।

তাই বুঝি আবার কেউ আসে? কি যে বল দিদি—বললেন সিলিক ঠাকুরমা।

সেই জন্যেই তো বাবার রাগও পড়ে না। ঝড় বৃষ্টিতে নাস্তানাবুদ হই আমরা।

ওরা দুইজন এগিয়ে যান।

ডাণ্ডীওলারা এগিয়ে গেল। ওদের 'শেঠ বাঁচো' রব আর শোনা যায় না। শোনা যায় থীরুর মাউথ অর্গান।

পাই-পয়সার লোভে আমাদের ঘিরে ধরেছে কয়েকটা ছেলে মেয়ে—ফুটফুটে, সুন্দর। একটা সিকি বের করে ওদের ভাগ করে

নিতে বলাতে আপত্তি জানায় তারা। বলে, তোমরা ভাগ করে দাও। সিচুয়েশন বুঝে মধ্যম পাণ্ডব নয়াপয়সা ছাড়ে। আমার কাছে খুচরো ছিল না, মধ্যম পাণ্ডব মুখ রক্ষে করলে।

টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। বিকেল গড়িয়ে যাবার আগেই পুরোনো পথে ফিরে আসি আমরা গৌরীকুণ্ডে। পথ পিচ্ছিল। ডাণ্ডী থেকে নেমে একটু হেঁটে আসতেই পড়ে গেলেন শিলঙের মেজদার মা। তাঁর সেবাশুশ্রূষার ব্যবস্থা করতে হল।

বিদেশ বিভুঁই। কেউ কারো নয়, তবু সবাই আমরা সবার। পরের জন্যে এই যে সেবা, এই যে সমদরদী মন, এই তো সম্বল। দেবদর্শনে কিম্বা তীর্থ ভ্রমণ করে পুণ্য সঞ্চয় হয় যতটা, সেবায় পুণ্যার্জ্জন হয় তার চেয়েও বেশী।

পায়ে ব্যথা হয়েছে অনেকের।

ব্যথার চোটে ঠাকুরপো হঠাৎ গলার স্বর সপ্তমে তুলে বলে ওঠেন, আমায় দে মা পাগল করে।

উচ্চারণে সুর হারায় না। পাগল হওয়ার সুর পাগলা হাওয়ায় ভাসে মন্দাকিনীর ঝরঝর শব্দতরঙ্গের মাঝে।

একটা রাত কেটে গেল।

ভোরে সবাই স্নান সেরে নিই একে একে গৌরীকুণ্ডের তপ্ত জলে। ভোরে স্নান সারা নিয়ম নয় এ পথে। নিয়মবিরুদ্ধ কাজ করি শুধু ঐ গরম জলের লোভে। অবশ কৃশতনু সালসা খাওয়ার পর যেমন সতেজ হয়, তেমনি চাঙা হয়ে ওঠে।

ধীরুর মাউথ অর্গান আর আমার তানসেনগুলি মৃতকল্পকে প্রাণদান করতে পারে এমন কথা জাহির করছি না, কিন্তু একথা ঠিক যে মুষড়ে-পড়া ক্লান্ত যাত্রীর মনে সঞ্চারিত হয় একটা উদ্দীপনা, একটা চেতনা।

আজ আমরা ত্রিযুগীনারায়ণ যাব। খানিকটা উৎরাই পেরিয়ে সাড়ে তিন মাইল খাড়া চড়াই। শরীর গতিক বুঝে অনেকে যেতে

চাইলেন না। তাঁরা সোজা পাটিগড় হয়ে রামপুরে চলে গেলেন, আমরা চললাম মুণ্ডকাটা গণেশ পেরিয়ে শোনপ্রয়াগের কাছে ডানহাতি রাস্তা ধরতে। ত্রিযুগীনারায়ণ হয়ে রাস্তা ঘুরে গিয়ে রামপুরের কাছে মূল রাস্তায় মিশেছে।

দলের লোকের সঙ্গে সাময়িক বিচ্ছেদ। রান্নার লোকেরাও নেমে গেল। কথা হল আমরা ত্রিযুগীদর্শন সেরে ফিরে এলে দল বেঁধে দুপুরের খাওয়া হবে। আমরা না ফেরা পর্য্যন্ত ওঁরা অপেক্ষা করবেন।

চড়াই সুরু হল। উঠছি তো উঠছিই। ঢালু খাদ অতল গহ্বরে নেমে গেছে। সারি সারি গাছ থরে থরে সাজানো। ওপাশের পাহাড়ে ঘন অরণ্যানী দিগন্তবিস্তৃত। ওদের অনেক আশা। মাথা উঁচু করে আকাশের কানে কানে বুঝি কিছু বলতে চায়। কি অসীম আকুতি, অপার স্থৈর্য্য নিয়ে যুগযুগান্ত ধরে ওই একইভাবে ওরা দাঁড়িয়ে থাকে।

একটু একটু করে উঠছি আর দম নিচ্ছি। বসতে ভয় করে পাছে যদি আলিস্যি আসে।

খাদের দিকের ঢালু জমিতে গ্রাম্য গৃহস্থের চাষের কাজ চলছে। পাহাড়ে লাঙ্গল দিয়ে চাষ করা দেখতে সমতলের অধিবাসী আমার ভালই লাগছে।

আমাকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে চট্টি চ্যাটার্জী বললে, কি দেখছ তানসেন? পাহাড়ের গা নিংড়ে রস বার করা দেখছ।

হ্যাঁ, জবাব দিই আমি, পালামৌর পথে সঞ্জীবচন্দ্র অশ্বত্থ বৃক্ষকে রসিক বলেছেন, আর এখানে! রসিক ওই গাড়োয়ালী চাষী, রসিক তার বলদ, রসিক ওই গম আর রবিশস্যের চারা, রসিক ওরা সবাই।

রসের কথা হচ্ছে বুঝি—পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে মধ্যমপাণ্ডব।

না, রসগোল্লার কথা হচ্ছে। টিনের খবর নিয়েছো, বাকী কিছু আছে ওতে,—জিজ্ঞাসা করি আমি।

জিভের জল জিভেই শুকিয়ে নিয়ে কোন জবাব না দিয়ে পা

বাড়ায় মধ্যমপাণ্ডব। নিঃশব্দে পেছু নেয় পঞ্চপাণ্ডবের আর চারজন।

খানিক দূর যেতে না যেতেই আমি একটু পেছিয়ে পড়ি। আমার ঠিক পাশাপাশি চলেছেন বোষ্টমাসী।

এক, তুই, তিন........আরে এ যে অনেক। ভেড়ার পাল এসে পড়েছে। গলায় ঘন্টি বাঁধা কারও কারও। মাথায় মস্ত সিং। সরে দাঁড়াই পাহাড়ের দিকে। ও কি, বোষ্টমাসী যে খাদের দিকে দাঁড়িয়েছেন। সর্বনাশ, একবার পড়ে গেলে, এ পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন যে।

চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করি, ওপাশে গেলেন কেন।

বুঝতে পারিনি বাবা। ভেবেছিলুম, তু দশটা হবে—বলে লাঠিটা তু হাতে শক্ত করে ধরে সামনের দিকে শরীরকে হেলিয়ে ঠকঠক করে কাঁপেন তিনি।

সামনে পেছনে কেউ নেই। ভেড়ার পাল দেখে যে যেখানে ছিল দাঁড়িয়ে গেছে। এমন রাস্তা জুড়ে চলেছে এরা যে একপাশ থেকে আর একপাশে যাবার উপায় নেই। আর কি ধূলোই যে ওড়ে! তবে ধূলো আমাদের সয়ে গেছে।

গঙ্গোত্রী থেকে যে রাস্তা ৺কেদারনাথে গেছে, তা এখানে এসে মিশেছে। ত্রিযুগী হয়েই যেতে হয় কি না। একটা তীর্থস্থান এমনি করেই আর একটা তীর্থস্থানের সঙ্গে বাঁধা পড়েছে পথের আলিঙ্গনে।

রোদটা বেশ চড়া হয়েছে। ঘামে জামা ভিজে গেছে। একটু যাঁরা এগিয়ে ছিলেন, তাঁরাও বিশ্রাম নিতে বসেন পাথরের ওপর। থীরু নতুন নতুন সুর তোলে মাউথঅর্গানে—ইংরেজী, হিন্দী ও বাংলা গানের সুর। ক্যামেরার কাজ চলে টুকটুক করে। পাই পয়সা চাইছিলো যে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা, তাদের কয়েকজনকে দাঁড় করিয়ে ছবি তোলা হল।

শাকম্বরী (মনসা) দেবীর মন্দির দেখাল পাণ্ডা। তার মুখেই শুনলাম শাকম্বরীদেবীর রক্তবীজ নিধনের কাহিনী। মন্দিরটি খুব বড় নয়—বস্ত্রখণ্ড দানের রীতি এখানেও আছে।

অদূরে একটি লোক ঢোল বাজিয়ে ভিক্ষে চাইছে। ভিক্ষা চাওয়ার ব্যাপারটা দেখছি সব জায়গাতেই এক। 'কলিতীর্থ কালিঘাট', পাণ্ডাবৃত পুরী আর মর্ত্যলোকনয়নসুন্দর মীনাক্ষী-মন্দির প্রাঙ্গনে দেখেছি একই ভাবে যাত্রীকে ঘিরে ধরে পয়সা চাইবার রীতি।

'ম' বাবু বললেন, এই তো এসে গেছে, আর একটুখানি।

এম. পি. বললেন, একটু একটু করে বেশ তো তাড়িয়ে নিয়ে চলেছেন আমাদের।

গুরুজী বললে, এ যেন সেই ঠাকুর্দ্দার মাথায় পাকাচুল তুলে দেওয়ার মত। একশ আর কিছুতেই হয় না। তেষট্টির পর আবার সুরু হয় তেইশ থেকে গোণা।

মাইল পোষ্টের দিকে আঙুল দেখিয়ে 'ম' বাবু বললেন, তা বলে মাইলের অঙ্ক কি মুছে দিতে পারি? আর এক মাইল পথ বাকী আছে। ঐ দেখুন।

ত্রিযুগীনারায়ণ দর্শন সেরে যাঁরা ফিরে আসছেন, তাঁরা বলছেন এমন কিছু নেই সেখানে দেখবার। কথাটা শুনে মনে হোল, সত্যিই তো, আমরা কি সত্যি সত্যি বিশেষ কিছু দেখতে যাচ্ছি? দেখবার যা কিছু, সে তো দক্ষিণ ভারতে, অথবা আগ্রা, দিল্লীতে। তবে আর এ পথে পা বাড়িয়ে এসেছি কেন? এখানে তো পথটাই দেখবার, পথের মানুষই তো দর্শনীয়।

তবে কি ওঁরা কিছু না দেখতে পেয়ে ঠকে গেলেন? ওঁদের কি পণ্ডশ্রম হল? ওঁদের কাছে কি পথ বা পথের মানুষ সুন্দর নয়? কি জানি।

ছড়িদার অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্যে। চটিতে অল্পক্ষণের জন্য বিশ্রামাদি সেরে মন্দির দর্শন করতে গেলাম।

নামেই প্রকাশ, এটি নারায়ণের মন্দির। যেখানে নারায়ণের বাস, সেখানে লক্ষ্মীর বাসা। সরস্বতীও আছেন। ত্রিকাল ধরে এখানে অধিষ্ঠিত দেবতা কিসের সাক্ষীস্বরূপ বিরাজমান, সে গল্প শোনা হল। হিমাচলনন্দিনী পার্বতীর সঙ্গে এইখানেই ধূর্জটির বিয়ে হয়েছিল আর স্বয়ং নারায়ণ ছিলেন তাতে সাক্ষী।

যদি বৈকুণ্ঠে যাবার বাসনা থাকে, তাহলে এখানে গোদান, সুবর্ণ-দান, ভূমিদান করো। মৃত্যুদোষ খণ্ডাতে চাও যদি, অষ্টাক্ষর মন্ত্র 'ওঁ নমো নারায়ণঃ' জপ করো একমনে।

রুদ্রকুণ্ড, বিষ্ণুকুণ্ড ও ব্রহ্মকুণ্ড পরিক্রমা শেষ করি একে একে। ভাল লাগছে বেশ। নারায়ণের চরণকমল নির্গত পুণ্যপাবনী ধারাই এই কুণ্ডতে পড়ছে।

ঘুরতে ঘুরতে যজ্ঞকুণ্ডের কাছে আসা গেল। সূর্যালোক প্রবেশ করে না, তাই বুঝি হোমাগ্নি জ্বলে অহরহ। না, তা নয়। যজ্ঞকুণ্ডে যে ধুনী প্রজ্জ্বলিত, প্রবাদ, তা তিন যুগ ধরে জ্বলছে। হোমকুণ্ডে যিনি শুদ্ধচিত্তে কাঠ চড়াবেন, তার জন্মজন্মাকৃত পাপক্ষয় হবে। তিনি মোক্ষপ্রাপ্ত হবেন।

বৌরাণীকে একমন কাঠ দেবার কথা বলতেই উনি রাজী হয়ে গেলেন।

আমি বললাম, একি করলেন।

কেন?

একমণ কাঠ যতক্ষণ জ্বলবে, ততক্ষণ কি আমরা থাকব এখানে?

গুরুজী বললে, আধপোড়া কাঠ ওরা আবার বেচবে অন্য যাত্রীর কাছে। এতো ভাল হল না।

বৌরাণী মৃদু হেসে বললেন, আমি তো বিশ্বাস করেই দিয়েছি। পাপ হলে ওরই হবে।

ধীরু বললে, এবেট্‌মেণ্ট অফ পাপ—সমান শাস্তি।

কোন যুক্তিই টিকল না। যার যা বিশ্বাস। এক মণ, আধ মণ,

দশ সের করে কাঠের দাম জমা হতে লাগল পাণ্ডার খাতায়। পঞ্চ-পাণ্ডব আমরা পূতবিভূতির টীকা নিয়ে দক্ষিণান্ত করি।

গৌরীকুণ্ড থেকে পাঁচ মাইলের পথে এখন পর্য্যন্ত উঠেছি মাত্র এক হাজার ফিট। কিন্তু প্রথমে উৎরাই নেমে আবার চড়াই পার হবার জন্য চড়াইটা বেশী মনে হল। তবু বেশীক্ষণ বিশ্রাম নেবার উপায় নেই।

মন্দির দর্শন সেরে চটিতে গা এলিয়ে দিতে গিয়ে এম. পি বকুনি খেলেন মুক্তোদাদার কাছে। 'ম' বাবু তাড়া দেন মুক্তোদাদাকে। বটকেষ্ট তাড়া দেয় 'ম' বাবুকে। অনেকে রওনা হয়ে গেছেন।

আজ অনেকটা হাঁটতে হবে। এবারে উৎরাই। নামতে নামতে ত্রিযুগীনারায়ণের শাখাপথ মূলরাস্তায় এসে পড়েছে যেখানে, সেখানটায় এসে পড়ি। একদফা জিরেন।

পোষাকগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখতে থাকি। মাথা থেকে সুরু। গুরুজী আর কুমারডুবীর শ্রীকুমারের মাথায় গামছা। চট্টি চ্যাটার্জী ও থীরুর মাথায় ফেল্ট হ্যাট। ডাক্তারবাবু ও জনি ওয়াকারের মাথায় ওয়াটারপ্রুফ টুপী। পিংখাড়ু ও খদ্দরের সার্টের মাথায় মংকী-ক্যাপ। জন গিলপিন, চার্লি চ্যাপলিনের মাথায় মাফলার জড়ানো। 'ম' বাবু আর গালিবের মাথায় কাউন্টি ক্যাপ। নীলগেঞ্জী, মুক্তোদাদা, ঠাকুরপো র‍্যাপার জড়িয়েছেন মাথায় ঘোমটা দিয়ে। রসগোল্লাদা জাহাঙ্গীর, মধ্যম পাণ্ডব, শিলঙের মেজদা, নন্দগোপাল বাবু ও আরও অনেকের খালি মাথা।

মাথার পর গা। বিচিত্র পোষাক গায়ে সকলের। গা দেখতে দেখতে কানে ভেসে এল হৃদয় তন্ত্রীতে আনন্দের ঢেউ তোলানো মাউথ-অর্গানের সা-রে গা-র সুর। বাজাচ্ছে থীরু। প্রাণের গভীরে সাড়া জাগে, কবি মন জেগে ওঠে। গান্ধারে গান ধরি আমি সব লজ্জা সঙ্কোচ কাটিয়ে,

ও ভোলা মন,
কেদারনাথে গিয়ে কি তুই করলি দরশন,

(সেথা) শীতের চোটে লেপের নীচেও কাঁপুনী ধরে হাড়ে,
লেপ যত দাও গায়ে চাপা ততই যে শীত বাড়ে।
(সেথা) দিনে রাতে বৃষ্টি হলেই হয় শিলার পতন
ও ভোলা মন—
(সেথা) মন্দিরেতে বিরাজ করেন মহাদেব শঙ্কর
শুদ্ধচিত্তে ভক্তিভাবে তাঁরেই প্রণাম কর
দেখবি তবে মনের তুয়ার হবে উন্মোচন
ও ভোলা মন........

থীরু সুর ঠিক করে দেয়। গানের তালে তালে পা ফেলে নীচে নেমে চলেছি। হাততালি দিয়ে উৎসাহ দেন অন্যান্য সবাই।

মিঃ দে বললেন, আপনাদের টীমে এলেই ভাল হত।

মধ্যম পাণ্ডব বললে, না এসেই বা কি ক্ষতি হল।

পাহাড়ের পথে পিঠে কাঠের বোঝা নিয়ে চলেছে যে পাহাড়ী যুবতী, সলজ্জ মুখ বার করে হাসে ঘোমটার ফাঁকে। গানের ভাষা তার কাছে অবোধ্য, কিন্তু আমাদের আনন্দাভিব্যক্তি নয়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যারা গান করে পয়সা চাইছিলো, তারা বিস্ময়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে।

অনেকটা পথ অতিক্রান্ত হল। মাইল পাঁচেক হবে। রামপুরে তুপুরের ভোজনপর্ব সেরে নেওয়ার ব্যবস্থা।

শান্তিদিদির পায়ে ব্যথা। 'ম' বাবু ঘোড়া ঠিক করে দিয়েছেন। শান্তিদিদি আর তার ঠাকুরপোর কথা কাটাকাটি খাওয়ার আসরে শান্তিভঙ্গ করে।

শান্তিদিদি বলেন, আমার মাথা খাও ঠাকুরপো, বাড়ীতে এ কথা লিখো না।

ঠাকুরপো বলেন, দাদাকে খবরটা দিয়ে রাখি। আমি তো মিথ্যে লিখছি না। সত্যিই তো তোমার পায়ে ব্যথা।

তা হোক, শুধু শুধু মানুষটাকে ভাবিয়ে তুলে কি লাভ, বল

দিইনি। আমার ব্যথা আমার থাক, তোমায় চিঠি লিখে সে কথা জানতে হবে না।

সে মানুষটা যখন বকাবকি করবেন এ সব জানতে পেরে, তখন কি হবে।

কিছু হবে না। আমার মাথা খাও ঠাকুরপো, একথা তুমি লিখতে পাবে না।

বেশ বাবা বেশ, এমনধারা মানুষ আমি দেখিনি। তোমার পায়ে কিছু হলে আমি জানি না।

ঠাকুরপো থামেন। শান্তিদিদির দিব্যি দেওয়া বুঝি সফল হল।

ওদিকে হাসির হুল্লোড় চলেছে। থীরু আবিষ্কার করেছে গুরুজীর পকেটে গগল্‌স্‌।

থীরু বললে, তুমি ওটা পকেটে নিয়ে ঘুরছ, চোখে দেবে কখন?

গুরুজী বললে, আর বল কেন, ছোট ভাইটা জোর করে সঙ্গে দিলে—ওটা পরলেই আমার নাকে ব্যথা হয়। আমি বাপু নাকে নথ পরতে পারব না।

খেতে দেরী হয় না। খাওয়া শেষেই রওনা।

সন্ধ্যায় ফাটা চটিতে এসে সেদিনের মত যাত্রা শেষ। আজ প্রায় পনের মাইল হাঁটা হয়েছে। আমাদের মুখে গল্প শোনবার জন্যে ব্যস্ত হলেন যাঁরা, তাঁদের হতাশ হতে হল; কেন না ক্লান্তি আর অবসাদে কথা বলবার ক্ষমতা নেই কারও। নিঃশব্দে শবাসন করে সবাই।

বটকেষ্ট এক সময় ডেকে তুলে খাইয়ে দিলে। বিছানা ছাড়তে ইচ্ছে করে না কারও। চোখের সামনে দেওয়ালের গায়ে হ্যারিকেনের ক্ষীণ শিখার দোলনে নড়ছে কতকগুলি আবছা ছায়া, ঘুম ঘুম চোখে তা এক সময় মিলিয়ে যায় রাত্রির গভীরতায়।

প্রভাতের স্নিগ্ধ সমীরণ রাত্রির জড়তা দূর হয়ে যাওয়ায় অবসাদমুক্ত শরীরে জাগায় শিহরণ। আলোর প্লাবনে স্নাত ধরিত্রীর নয়নমুগ্ধকর

শোভা মনকে অভিভূত করে। অসীমের ডাকে রক্তে বুঝি আবার দোলা লাগে।

খবরের কাগজ পড়বার তাড়া নেই, সেলুনে লাইন দেবার ব্যস্ততা নেই। কাগজ আসে না আর পঞ্চপাণ্ডব এই কদিন দাড়ী কামাবার পাট তুলে দিয়েছি। একটিমাত্র কাজ ছিল আমাদের। সেটা হচ্ছে কেবল পথে পথে এগিয়ে যাওয়া।

ফাটা চটি ছেড়ে চলতে চলতে আমরা দুপুর নাগাদ এসে পড়লাম নারায়ণ বা ভেতা চটি। খুব ক্লান্ত না বোধ করলে আমরা দিনের বেলায় আর গড়িয়ে নিতে চাই না।

এখানে ভদ্রেশ্বরের প্রাচীন মন্দির ও একটি কুণ্ড।

বেশ করে সাবান মেখে স্নান সেরে নিই। কুণ্ডের জলে সাবান মাখা বা সাবান কাচা পাণ্ডাদের অভিপ্রায় নয়। তবে যে দেশে মূল্য ধরে দিলেই বিধিনিষেধের জলাঞ্জলি হয়, সেখানে সে সুযোগ লাভে বঞ্চিত থাকিনি।

থীরু এক কাণ্ড করলে। পাণ্ডা থীরুকে সঙ্কল্প করতে বলায় থীরু সাষ্টাঙ্গে গুরুজীকে প্রণাম করলে সর্বসমক্ষে। তারপর গম্ভীরভাবে গুরুজীকে দেখিয়ে বললে, ইয়ে হ্যায় মেরা গুরুজী।

পাণ্ডা বিশ্বাস করে চলে গেল। না বিশ্বাস করে উপায় আছে! গুরুজীর দিব্যকান্তি, প্রসন্নবদন, পরণে গামছা, দাড়িগোঁফে সমাচ্ছন্ন গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মুখ আর থীরুর সপ্রতিভ অভিনয়।

রাস্তার দিকের উল্টো দিকে সচরাচর কোন চটির দরজা বা জানলা থাকে না। এখানে আমাদের চটির পেছনের দিকে ছোট একটি দরজা ছিল। মাথা নীচু করে যেতে পারলে অনেকটা পথ সর্টকাট হয়।

এমনিতে পিংথাড়ু বেশ চ্যাঙা। ওঁর মাথাটাই আগে ঠুকল। অবসন্ন দেহ, আচম্বিতে আঘাত, মোক্ষমভাবে লেগেছে বেচারীর। মুক্তোদাদা সবাইকে সাবধান করে দিলেন। চট্টি চ্যাটার্জী ব্যাগ থেকে চকখড়ি বার করল, যা জিনিষপত্র নিশানা করবার জন্যে আনা

হয়েছিলো। দরজার ওপরে থীরু বড় বড় করে লিখে দিলে 'মাথা বাঁচাও'।

কিন্তু লিখলে কি হবে, যাঁরাই সর্টকাট করতে গেছেন, প্রায় সবারই মাথা ঠুকে গেছে। মধ্যম পাণ্ডব তেল মেখে ওই দরজা পেরিয়ে যাবার সময় দুহাত কপালে ঠেকিয়ে বলতে বলতে গেল, 'আমার মাথা নত করে দাও হে'।

এম. পি. বললেন, মাথা নেই তার মাথা ব্যথা।

হাল্কা হাসির হুল্লোড় চলে।

গতকাল রাত্রের খাওয়াটা যুতসই হয়নি। মধ্যম পাণ্ডব দোকানীর কাছ থেকে 'আলুকা ছোকা' কিনে নিয়ে এল। ভাত খাওয়ার বুঝি একটু দেরী আছে, এক থালা শেষ হতে আর এক থালা 'আলুকা ছোকা' এল। দিদিমণি খেলেন না, ওঁর সন্দেহ আমরা এতে পিঁয়াজ মিশিয়েছি।

ওদিকে কে যেন চেঁচাচ্ছেন। তিনি গেঞ্জীটা সাবান দিয়ে কাচার পর শুকোতে দিয়েছিলেন, আর খুঁজে পাচ্ছেন না। অবাক কাণ্ড, পুরোণো গেঞ্জী কে নেবে।

থীরু বললে, শেয়ালে নিয়ে গেছে।

গুরুজী বললে, আমি ধার দোব গেঞ্জী, অবশ্য গায়ে হলে।

ঠাট্টা বুঝতে পেরে উনি চুপ করে যান। গেঞ্জী হারানোর রহস্যটা কিন্তু পরিস্কার হয় না।

খাবার এসে গেছে। গরম ভাতে ঘি, ডাল, চচ্চড়ি, ভাজা, ডালনা, চাটনি। পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে বাঁচি। বাঁচাই বটে।

ভোগতৃষ্ণা আছে বলেই ভোজের ব্যবস্থা করতে হয়। দেবতার ভোজ্য ভোগ হ'য়ে ফিরে আসে আমাদের কাছে। আমরা দেবতার নামে নৈবেদ্য উৎসর্গ করি ভোগাসক্তি আছে বলেই তো। ভোগে আসক্তি নেই কার। কারও বা নৈবেদ্য উৎসর্গীকৃত ভোগ পেয়ে তৃপ্তি, কেউ বা পার্থিব সুখশান্তি ও ধনৈশ্বর্য্য ভোগবিলাসী, কেউ বা দুইই।

উৎরাই পথে নীচের দিকে চলেছি। নির্মেঘ নিঃসীম নীলাম্বর, সবুজের সারি আর ধূসর ধূলিতে অপরূপ বর্ণালী। নিজস্ব গতিতে এগিয়ে চলেছি।

মুক্তোদাদা মাঝে মাঝে বলে ওঠেন, 'লাভলি'।

বোষ্টমাসী, সিলিক ঠাকুরমা, বাগনানের দিদিমা আছেন আগেই। শিবপুরের মামীমা, বোলপুরের শান্তিদিদি এগিয়ে গেলেন। 'শেঠ বাঁচো, শেঠ বাঁচো' রব তুলে এগিয়ে যায় ডাণ্ডীওলা।

৺কালীমঠের রাস্তায় আর যাওয়া হল না। এটি পীঠস্থান। শুনলাম, এখানে পাঁঠা আর মোষ বলি হয়।

নালাচটির কাছে একটি বিরাট দলের মুখোমুখি হই। বাঙালী সবাই। আমি সুযোগ বুঝে ক্যানভাসারের ঢঙে তানসেনগুলি বেচতে শুরু করি। যতটা আশ্চর্য্য হন ওঁরা, তার চেয়েও বেশী খুশী হন, বুঝতে পারি। থীরু মাউথঅর্গান বাজিয়ে আনন্দবর্দ্ধন করে সকলের। গানের তালে তালে নাচেন খদ্দরের সার্ট, নীলগেঞ্জী। হাততালি দেন 'ম' বাবু, গালিব। মেয়েরা মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাসেন আমাদের অঙ্গভঙ্গী দেখে।

মুক্তোদাদা বলেন, ঠিক যেন পিকনিক পার্টি।

নুরজাহান বললেন, সত্যিই, পথটাকে আপনারাই সোজা করে দিয়েছেন।

হেসে বলি, এটা কি প্রশংসা না আর কিছু।

জাহাঙ্গীর বললেন, আনন্দ পাওয়া আর আনন্দ দেওয়া ছাড়া আর কিছু কাজ যখন নেই আপনাদের, তখন প্রশংসা ছাড়া আর কিই বা করতে পারা যায়।

যাঁরা উত্তুঙ্গ তুঙ্গনাথে যাবেন না, তাঁরা গুপ্তকাশী হয়ে বাস পথে চমৌলী যাবেন বলে ফিরে গেলেন। আমাদের আগেই তাঁরা চমৌলীতে পৌঁছে যাবেন। আমরা যাব হাঁটাপথে।

আবার একদফা বিচ্ছেদ। রসগোল্লাদা, এলাহাবাদের পিসীমা,

ঠাকুরপো, নীলগেঞ্জী আরও অনেকে রইলেন সে দলে। গৌরীকুণ্ডে ডাণ্ডী থেকে পড়ে গেছলেন শিলঙের মেজদার মা, তাঁকেও নেমে যেতে হল। দলের অতজন আমাদের সঙ্গে যেতে পারলেন না, তাই মনটা একটু ভারাক্রান্ত হল।

শিলঙের মেজদার মায়ের পায়ের অবস্থা যে রকম, তাতে আমরা সবাই চিন্তিত। আমাকে বললেন, আমার আর তুঙ্গনাথ যাওয়া হল না। ভালোয় ভালোয় যেন বাবা৺বদরীনাথকে দর্শন সেরে ফিরতে পারি।

ওঁর ছেলে বললেন, তুমি ভাবছ কেন মা। পঞ্চপাণ্ডব ছেলে তোমার. ওদের চোখ দিয়েই তুমি দেখবে।

গুরুজী বললে, ষষ্ঠ পাণ্ডবও আর পাঁচ ভায়ের চোখ ধার করবে।

পিংখাড়ু বললেন, অর্থাৎ কি না আপনিও শুনবেন বর্ণনা।

শিলঙের মেজদা বললেন, ঠিকই তো।

সেই বিরাট দলটি পার হয়ে গেল। আমাদের কাছে জেনে নেন কেউ কেউ পথের বিবরণ, বরফ জমে আছে কি না, বৃষ্টি পাবেন কি না।

গুপ্তকাশীর রাস্তা ছেড়ে বাঁয়ে রাস্তা ধরে এগিয়ে এসেছি অনেকটা।

একজায়গায় পথের পাশে একটি ক্ষেতে দুটি পাহাড়ী মেয়েকে কাজ করতে দেখে থীরু ক্যামেরা ফিক্স করে। ও মা, এ কি! বুঝতে পেরেই ওরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

রাঙাদি হাসতে হাসতে বললেন, বেশ হয়েছে, যেমন মেয়েদের ছবি তুলতে যাওয়া!

মুক্তিবৌদি বলে ওঠেন, মুখ্যু, মুখ্যু, তাই মুখ ঘুরিয়ে নিলে। এমন সোনার চাঁদ ভায়েরা আমার। তোদের ছবি তুলে নামকরা কাগজে ছাপিয়ে দেবে, দেশবিদেশে যাবে সেই কাগজ, তবু তোদের লোকে চিনবে। তা নয়, মুখ ঘুরিয়ে নেওয়া হল।

আমরা দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে এম. পি, দিদিমণি আর বৌরাণী এসে পড়েন।

থীরুর ছবি তুলতে না পারার কথা শুনে মেয়েদের ডেকে ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দীতে বৌরাণী বললেন, তোমাদের আপত্তিটা কিসের ভাই।

ওরা বলে, এখান থেকে আমাদের ছবি তুলে নিয়ে গিয়ে তোমরা যে দেশে ফিরে বলবে এখানকার আওরত এমনধারা, সেটি হচ্ছে না। টাকা টাকা লাগবে মাথা পিছু, তাহলে ছবি তুলতে দোব।

ছড়িদারও সেই সময় এসে পড়ল। গাড়োয়ালী ভাষায় তাদের বুঝিয়ে বলবার জন্যে অনুরোধ করাতে সে তাই করল।

ওরা কিন্তু টাকা নেবেই। তা হলে লজ্জা নয়, যুক্তি নয়, শুধুই লোভ। লোভের প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়। ক্যামেরা গুটিয়ে ফেলতে দেরী করি না।

গুরুজী বললে, থীরু, তোমার তাহলে ফটো কম্পিটিশনে ছবি দেওয়া হল না।

থীরু জবাব দিলে, না হোক।

ঢালু জংলা পাহাড়ী পথ। নদী পার হতে গেলে নামতেই হবে। যখনই নদী পার হতে হয়েছে, তখনই এমনধারা নামতে হয়েছে, আর নামা মানেই হচ্ছে আর একবার ভীষণ খাড়া চড়াই পার হওয়া।

নদীর অবিশ্রান্ত ধারায় তার মহাদেবের জটা হতে নির্গত হওয়ার কাহিনী লুকিয়ে আছে, আছে তার এই মর্ত্যলোকে আসার বার্তা। বেশ ভাল লাগছে হাঁটতে। ছায়াঢাকা পথে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে এগিয়ে চলেছে অচেনাকে চেনবার আশায় যাত্রীদল। অনিশ্চিতের হাতছানিতে যেমন অঙ্কুর জেগে ওঠে, তেমনি জেগে ওঠে পথপরিক্রমার বাসনা মনের নিভৃত কুঠুরীতে।

মন্দাকিনীর পুল দেখা যাচ্ছে।

উত্তরাখণ্ড বিদ্যাপীঠের সাইনবোর্ড দেখে আবার দাঁড়াতে হয়। বিদ্যাপীঠ সংলগ্ন একটি দোকানে পাওয়া গেল লেমনজ্যুস, পাঁচনচূর্ণ, মালিশতেল ইত্যাদি। আয়ুর্ব্বেদীয় অন্যান্য ওষুধও আছে। দাম খুব বেশী নয়। বেশ বিক্রী হল দোকানটায়। কেদারে যাবার পথে

মাল্টালেবু পেয়েছিলাম 'জরিনা ফ্রুট গার্ডেন' থেকে। এখানে লেবুর বদলে পাওয়া গেল লেমনজ্যুস।

নুরজাহান ও জাহাঙ্গীর ঠিক সামনেই চলেছেন। কি যেন কথা হচ্ছে দুজনের। পাশ কাটিয়ে যেতে জাহাঙ্গীরের একটা কথা কানে এল, তোমার চেয়ে সুন্দরী আরও আছেন এ দলে, তুমি ভেবো না তুমিই সবচেয়ে সুন্দরী। ওঁদের স্বামী-স্ত্রীর কথা শোনার প্রয়োজন নেই। হনহনিয়ে হেঁটে পার হই তাঁদের।

বিদ্যাপীঠের অনতিদূরে একটি পরিত্যক্ত মন্দির। তার গেটে তালা ঝোলান। একদিন হয়ত পূজার্চনা হ'ত, আজ হয় না।

পুল পার হয়ে আবার চড়াই। নদীর ওপারে দূর থেকে গুপ্তকাশীর চটি, দোকান সব দেখা যাচ্ছে। মাঝে একটা বিরাট ফাঁক।

বছর পনের বয়সের একটি মেয়ে আর বছর দশেকের একটি ছেলে পাশাপাশি যাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল দুই ভাই বোন তারা গুজরাট থেকে আসছে। সঙ্গে বাবা মা আছেন, তাঁরা পিছিয়ে পড়েছেন। ওরা হাঁটতে পারছে না। বোন ভাইকে উৎসাহ দিচ্ছে, ভাই দিচ্ছে বোনকে।

ছেলেটি বললে, জানেন, বাবা আমাদের ঘোড়া নিতে বলেছিলেন, আমরা নিইনি।

তাদের বাহবা দিলাম আর দিলাম একটু তানসেনগুলি। কি আনন্দ ওদের!

এ পথে খানিকটা অবধি গাছগাছড়ার চিহ্ন নেই বললেই হয়। মুক্তাঙ্গনে আলোকের মেলা। আবার বনানীশ্রেণী। আলোকের লুকোচুরি খেলায় সাক্ষী আমরা এগিয়ে চলি।

দুপুরে ভাত খাওয়ার পর উৎরাই পথে চলতে কষ্ট হয় না, কিন্তু চড়াই ভাঙ্গতে জীবন বেরিয়ে যায়। আর এপথে চড়াই উৎরাই আছে জেনেই তো আসা।

এক একবার মনে হয় পাহাড়ের দিকটা বুঝি জীবন আর খাদের

দিকটা মৃত্যু। আর আমরা চলেছি জীবনমৃত্যুর সীমারেখার ওপর দিয়ে সন্তর্পণে।

চমৎকার দৃশ্য এখানটায়। ওপাশের পাহাড়ের তটদেশ পর্য্যন্ত দেখা যায়। আর কত যে ক্ষেত, কত শস্য, কত ফুল, কত ফল।

একটা ছেলে অন্ধ সেজে ভিক্ষে চাইছে। তাকে ধমক দিতে সে কেঁদে ফেলল আর অন্ধের চক্ষুষ্মান হয়ে দৌড়ে পালানো দেখে অবাক হল অনেকে।

ইতিমধ্যে হঠাৎ একদল মোষ পথ আগলে দাঁড়াল। ওদের বিরাট বপুর সঙ্গে একটু সংঘর্ষ হলেই গেছি আর কি! একপাশে সরে দাঁড়াই। গুজরাটি ছেলেটি ভয়ে থীরুকে জাপটে ধরে রইল।

জীবনের চলার পথে এমনি নির্ভাবনায় আমরা যদি অপরকে আঁকড়ে ধরে থাকতে পারতাম, তা হলে বোধ হয় বিশ্বাসভঙ্গের দায় থেকে মানুষ বাঁচত।

এবার ভিক্ষাপ্রার্থী নিতান্ত একটি শিশু। তার পেছনে অবশ্য ছোটখাট একটি দল। গ্রাহক অনেক কিন্তু দাতার সংখ্যা অল্প। মধ্যম পাণ্ডব এগিয়ে আসে। ওদের খুশী করে নানাভাবে।

পা আর চলে না। কোনও মতে তাকে টানতে টানতে সন্ধ্যের আগেই উখীমঠে পৌঁছে গেলাম।

এই উখীমঠ! কত নাম শুনেছি এ জায়গার। বইতে পড়েছি কত কথা এর সম্বন্ধে। পাথরে বাঁধানো রাস্তার গোড়াতেই মন্দির। মন্দির পেরিয়ে চটি বা ধর্মশালা। অনেকে চটিতে চলে গেলেন, বিশ্রামান্তে মন্দিরে আসবেন।

আমরা কিন্তু ধুলোপায়েই মন্দিরে গিয়ে উঠি। সঙ্গে রইলেন এম. পি., রাঙাদি, 'ম' বাবু, ও বৌরাণী। রাস্তা থেকে সিঁড়ির অনেকগুলি ধাপ মন্দিরের প্রবেশপথ পর্য্যন্ত। সেখান থেকে একবার সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। একজন দু'জন করে তখনও আসছেন।

উখীমঠের উচ্চতা সাড়ে চারহাজার ফিটের মত। এগার হাজার

সাতশ পঞ্চাশ ফিট থেকে এই কয়দিনে এতটা নেমে এসেছি। দিনের আলো ক্রমশ ম্লান হয়ে আসছে। অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখে বিমোহিত হয় মন। দিক চক্রবালে ঐ যে পাহাড়শ্রেণী, ওখানে যাবার জন্য কি দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা! যদি লাভ দিয়ে যেতে পারতাম, বেশ হোতো।

মন্দিরের ভেতরে একটা মস্তবড় উঠান। গর্ভমন্দিরে যেতেই পূজার ব্যবস্থা করলে পাণ্ডা। পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণে আর কিছু না হোক মনটা শুচি হয় নিজেরই। পঞ্চকেদারের মূর্ত্তি, শিব পার্বতীর মূর্ত্তি, আরও কত মূর্ত্তি, এখানে সেখানে। পাণ্ডার সরলতা ভাল লাগল।

তাকে জিজ্ঞাসা করার আগেই সে শুনিয়ে দেয় উখীমঠের নামেতিহাস। বাণ নামে অসুরের রাজধানী ছিল এ জায়গা। তার মেয়ে উষা। উষা থেকে উখা, উখা থেকে উখী। তাই উখীমঠ। প্রসঙ্গত শ্রীকৃষ্ণের নাতি অনিরুদ্ধর উষাহরণ বৃত্তান্তও শুনলাম। আরও জানলাম রাওয়লজী মন্দিরেই থাকেন এবং শীতের ছমাস ৺কেদারনাথের পূজারতি এখান থেকেই হয়।

মন্দিরের গায়েই একটা বড় দোকান। সব জিনিষই পাওয়া যায় দেখলাম। এমন কি খোঁজ করতে করতে খামপোষ্টকার্ডও পাওয়া গেল। সামনের চত্বরে বসে চিঠি লিখতে বসি।

হঠাৎ টিপ টিপ করে জল এল। দেখতে দেখতে আকাশটা কালো হয়ে গেল মেঘে। চটিতে গেলেই বটকেষ্ট গরম চা পাকৌড়ী খাওয়াবে, কিন্তু বৃষ্টিতে যাওয়া যায় কি করে।

এম. পি. বললেন, তাহলে এখানেই চা পকৌড়ী চলুক।

এতে আপত্তি নেই কারও। চট্টি চ্যাটার্জী অমনি অর্ডার দিল চায়ের দোকানে। ফিরে এসে সে চুপি চুপি জানালে কারা যেন ডিম সেদ্ধ করবার জন্যে চটিওলার কাছে গরমজল ম্যানেজ করছেন। যে খাচ্ছে খাক, এ নিয়ে আমরা আর হৈ চৈ করি না। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে মাঝে মাঝে।

'ম' বাবুর লক্ষ অন্য দিকে। তিনি নজর রাখছেন সবাই এসে পৌঁছুল কি না। ডাকের চিঠি 'ম' বাবুর হাতে দিতে এসে খটকেষ্ট খবর দিয়ে গেল সবাই এসেছে। 'ম' বাবু জানালেন গালিবের টেলিগ্রাম এসেছে। চা খাওয়ার পর থীরুর মাউথঅর্গান বেজে ওঠে। গুরুজীর কণ্ঠে শুনি 'চল বেটা'। বৃষ্টি থামেনি, তবে কমে গেছে। বাজনার তালে তালে রুট মার্চ করতে করতে আমরা চটিতে গিয়ে আস্তানা নিই। আমরা যেতে অনেকে আবার মন্দিরে এলেন। পিচ্ছিল পথে সকলকে সাবধানে চলতে নির্দেশ দেন 'ম' বাবু। আর একটা রাত কাটল।

ভোর রাতে দোরে করাঘাত শুনে ঘুম ভেঙ্গে যায়। গালিবকে অত ভোরে আমাদের ডেকে তুলে দেবার কারণ খুঁজে পাই না।

কিছু বলার আগেই তিনি বললেন, আমি আজ ফিরে যাচ্ছি। যাবার আগে পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে দেখা না করে গেলে অপরাধী হয়ে থাকব।

ফিরে যাচ্ছেন কেন?—থীরুর প্রশ্ন।

কাল খবর এসেছে, মেয়ের বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে। আজই ফিরতি পথ না ধরলে বিয়ের আগে কলকাতায় পৌঁছুতে পারব না।

এত দূর এসেও আপনি বদরীনাথ যাচ্ছেন না, এটা দুঃখের কথা, আপনারও, আমাদেরও।

বিষাদগ্রস্ত ভাবে বললেন গালিব, উপায় নেই।

নমস্কার প্রতিনমস্কার সারা হলে উনি চলে গেলেন।

বিচ্ছেদের সুর স্থায়ী হবার আগেই চট্টি চ্যাটার্জী বললে, বাড়ীর লোককেও বলিহারী। বিয়ের তারিখ দিন কতক পেছিয়ে দিলে কি ক্ষতি হত।

ক্ষতি হত—গুরুজীর কথায় বিস্মিত হই আমরা।

তার মানে—মধ্যম পাণ্ডব জিজ্ঞাসা করে।

গুরুজী জবাব দেয়, ছেলে হাতছাড়া হয়ে যেত। আজকাল ছেলে পাওয়া যে কি ব্যাপার তা নিজেদের দিয়েই বিচার কর! দলে দলে যদি আইবুড়ো হয়ে থাকো, তবে মেয়ের বাপ আর নিশ্চিন্ত হয়ে ৺কেদার বদরী করবে কি করে বলো।

ঘাঁটিয়ে লাভ নাই। চুপ করে যাই সকলেই।

জংবাহাদুর এল। আমার ভাগের চা ওর বরাদ্দ। আমি যে চা খাই না কোনদিন সকালে, সেটা 'ম' বাবুকে জানাইনি। বটকেষ্ট মারফৎ ভাগের চা নিয়মিত আসে আর সেটা চলে যায় জংবাহাদুরের কাছে। ওর ছোটভাইও পায় এক এক দিন। শুধু চা-ই নয়, কচুরী, সিঙাড়া, হালুয়াটাও দিয়ে দিই কোন কোন দিন।

বিছানা বাঁধা শেষ করে ওকে দিতে পারলে তবে ও নড়বে। ও চলে গেলেই থীরু আর গুরুজী তাড়া দেয়। হিমে ভেজা পাহাড়ী পথে নেমে পড়ি দল বেঁধে। 'ম' বাবুর কাছ থেকে জেনে নিয়েছি আজকের সকালের ভোজন সারবার ঘাঁটির দুরত্ব। প্রায় ৬ মাইল রাস্তা শেষে দৈড়া চটি।

শীতের প্রকোপ বেশী নয়। তবু রৌদ্রের প্রচণ্ড দাহ নেই বলে চলতে ভাল লাগে। শস্যক্ষেতের পাশ দিয়ে, পাইনগাছকে উঁকি মেরে গগনচুম্বী পাহাড় শ্রেণীকে পরিবেষ্টন করে পাহাড়ী পথ এঁকেবেঁকে চলে গেছে। আমরা সেই পথের পথিক, বন্ধুর পথে বন্ধু হই পথের। ভোজনং যত্রতত্র, শয়নং হট্টমন্দিরে। পথই মন্দির, পথের মানুষই দেবতা।

খাড়া চড়াই। তবে সকালের স্নিগ্ধতায় চট করে ক্লান্তি আসে না কারও। পিংখাড়ু আজ চলেছেন আমাদের সঙ্গে। পিংখাড়ুর সঙ্গ আমার ভালই লাগে। তুঙ্গনাথ পর্য্যন্ত তিনি একই সঙ্গে থাকবেন।

থীরু বললে, কই বাবা, সে রকম সাধু সন্ন্যাসীতো চোখে পড়ল না।

ঠিকই বলেছে ধীরু। রাস্তা জুড়ে তো আমরাই চলেছি। দোকানে চটিতে স্থানীয় লোকেদের দেখা যায়। ট্যুরিষ্ট আর স্থানীয় অধিবাসীদের ভীড়ে সাধু সন্ন্যেসীরা যে কোথায় হারিয়ে যান, খুঁজে পাওয়া যায় না। একেবারে নেই এমন নয়। তবে সংখ্যায় খুব বেশী নন তাঁরা।

কাঁথা চটি এল। নীলগেঞ্জী দম নিচ্ছিলেন একটা পাথরের ওপর বসে। আমাদের দেখতে পেয়ে আবার চলতে সুরু করেন। তাই দেখে হোমিওপ্যাথী ডাক্তারবাবুও ক্যামেরা গুটিয়ে উঠে পড়েন। উনি কারও সঙ্গে বড় একটা মেশেন না। দু-একবার যেচে কথা বলতে গেছি, কিন্তু সে রকম সাড়া পাইনি। কত রকমের লোকই আছেন।

দুপাশের রূপশোভা দেখতে দেখতে চলেছি। ভাবুক যারা, কবি যারা, কল্পলোকের মানসতা নিয়ে যাদের কারবার, তাদের সৌন্দর্য-বিলাসী মনে এ হেন রূপশোভায় কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে জানি না। সাধারণ যাত্রী আমরা বিধাতার হাতে গড়া এই চিত্রশালায় প্রতিটি চিত্রকে, তার মডেলটিকে মনের ক্যানভাসে এঁকে ফেলবার চেষ্টা করছি। শিল্পী মন শিল্পসৃষ্টিতে আনন্দ পায়, কিন্তু বিধাতাসৃষ্ট শিল্পের শোভায়ও শিল্পীর আনন্দ কম নয়। যা কল্পনায় উদ্ভূত হয়, তাকে সঠিক রূপ দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে উপভোগ করার যে চেষ্টা, সেটা নিছক বিলাস নয়। সাদা চোখে যা দেখা যায় না, তাকে রঙীন চোখ দিয়ে দেখতে হয়। এ রঙীন চোখ কল্পনার চোখ। তার কল্পিত রূপ যখন চোখের সামনে মূর্ত হয়ে ওঠে, তখনকার সে আনন্দ হয় অপরিসীম। 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি'।

পথের নেশায় মাতাল মন পথেই আনন্দের উপকরণ খোঁজে। ডাকবাক্স দেখে ক্ষণিকের তরে ঘরের জন্য উতলা হয় মন, পরক্ষণেই সহযাত্রীদের মধ্যে খুঁজে পায় প্রিয়জনকে। এদেরই মধ্যে ধরা দেন দাদা, দিদি, বৌদি, পিসিমা, ঠাকুরমা, ঠাকুরপো। এঁদের চেয়েও আপন বুঝি কেউ নেই।

হাসি, ঠাট্টা চলেছে যেমন, তেমনই চলেছে সঙ্কোচ, আত্মম্ভরিতা, কুণ্ঠা, বিনয়ের পরাকাষ্ঠা।

কৌতূহলী মন জানতে চায় অনেক কিছুই, কিন্তু এই যে যাত্রীদের স্রোত, তাতে কৌতূহলী মন নিয়ে বসে থাকা যায় না। কত ঝোপ-ঝাড়, কত গাছ, কি নাম ওদের, কি ফুল ওইগুলো, তা জেনে নেবার জন্যে অপেক্ষা করলে চলবে না। চলতে চলতে জানো, জানতে জানতে চলো।

গোলিয়াবগড় চটি রইল পড়ে।

অনেকটা চড়াই পার হয়ে দৈড়া চটিতে আসা গেল শেষ পর্য্যন্ত। উখীমঠ থেকে প্রায় দেড় হাজার ফিট ওপরে চলে এসেছি। একটু বিশ্রাম, কনকনে ঝরণার জলে কোনও মতে হাত মুখ ধোয়া এবং মধ্যাহ্ন ভোজন। আবার যাত্রা সুরু। এ বেলার পথও চড়াই।

মেঘের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে সূর্য্য। বাতাস ঠাণ্ডা। কাঁধের সোয়েটার গায়ে চাপাতে হল।

এম. পি. বললেন, আমি কিন্তু আপনার মত শীতকাতুরে নই।

আমি বলি, শীত না করলেও অনেকে গরমজামা গায়ে দেন সৌখীনতা জাহির করতে, আমি সে দলের লোক নই।

জনি ওয়াকার হঠাৎ আমাদের কথার মাঝখানে বলে ওঠেন, আমারও শীত করে না মোটে।

তারপর আমাদের দুজনের দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে চলে গেলেন।

এম. পি. বললেন, লোকটা এক রকমের।

আমি বললাম, তাই তো দেখছি।

মধ্যম পাণ্ডব বললে, চেপে যাও দাদা।

আসলে এখানকার আবহাওয়াটাই এমন যে, আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরাও বেশ ঘোল খেয়ে যাবেন। এই শীত, এই বর্ষা, এই গ্রীষ্ম, এই বসন্ত। গরম হচ্ছে দেখে কোটটা হয়ত বেডিং থেকে বের

করলেন না, কিছু পরেই হয়ত অনুভব করলেন কনকনে ঠাণ্ডা। বসন্তের হাওয়া দেখে ছাতিটা দিলেন কুলীর কাছে, অমনি এল ঝমঝম করে বৃষ্টি। এমনই হয়।

একপাল মোষ তাড়িয়ে নিয়ে আসছে একটি পাহাড়ী যুবক, হাতে তার বাঁশী।

গুরুজী বললে, আহা, যেন কেষ্ট ঠাকুরটি গো।

ধীরু তাকে ডেকে নাম জিজ্ঞাসা করে। জড়িয়ে জড়িয়ে কি যে বলল বোঝা গেল না।

হাঁটুর ব্যথাটা আবার যেন চাড়া দিয়ে উঠেছে। আমার গতির মন্থরতা প্রাপ্তি মুক্তোদাদার নজর এড়ায়নি। কাছে এসে বললেন তানসেন, একটু আদা দোব ভাই।

দিন—হাত বাড়িয়ে নিই।

হঠাৎ বাতাসে ভেসে আসে টারজেনের মত ডাক। এ নিশ্চয়ই চট্টি চ্যাটার্জি। উত্তর দিই গলা ফাটিয়ে। রাজস্থানী, মাদ্রাজী যাত্রীরা বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। ভাবে এ বুঝি আমাদের বিশেষ কোন সঙ্কেতধ্বনি।

সিলিক ঠাকুরমার ডাণ্ডী পেরিয়ে গেল। পেরিয়ে গেল আরও অনেকের ডাণ্ডী, কাণ্ডী। বিস্তীর্ণ অরণ্যানীর মধ্য দিয়ে পথ। বাতাসে আন্দোলিত হয় তরুশাখা। কেমন একটা শব্দ ওঠে। শুনতে শুনতে এগিয়ে চলি।

দোগলভীটা চটি রইল পেছনে।

'বাবু, বাবু' ডাক শুনে পেছনে তাকাই। জংবাহাদুরের ভাই কিছু পয়সা চাইছে। পথে কুলীদের এমনিধারা কিছু দিতে হয়। বড় মায়া হয় ওদের দেখলে। মুখে 'শেঠ' ছাড়া কথা নেই, 'মহারাজ' ছাড়া সম্বোধন নেই। টগবগ টগবগ করতে করতে জন গিলপিনের ঘোড়া এগিয়ে গেল। দেখতে দেখতে আরো দু হাজার ফিট ওপরে উঠে এলাম।

পাঞ্জাবীদের একটা ছোট দল আমার ঠিক আগেই। ওদের প্রত্যেকে আমার চেয়েও বলিষ্ঠ, কিন্তু চোখমুখের চেহারা বা হাঁটার ধরণ দেখলে কে বলবে সে কথা। একজনের সঙ্গে আলাপ করে জানি, তিনি দিল্লীর একটা কটন মিলের মালিক। সামান্য করণিক আমি, আমার সঙ্গে তার কোন তফাৎ নেই যাত্রী হিসেবে আজ। পদযাত্রা দুজনেরই।

সন্ধ্যে নাগাদ কোনও মতে ধুঁকতে ধুঁকতে বেনিয়াকুণ্ড চটিতে পৌঁছে গেলাম। পাম্প করে কে যেন আমাদের জীবনরস বার করে নিয়েছে। নিস্তেজ নির্জীব কয়েকটি প্রাণী আমরা মেঝের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ি। বিছানাটা পেতে নেবারও সামর্থ্য নেই কারও।

বটকেষ্ট রাত্রের খাবার দিতে এল যখন, তখন উঠে বসি। বটকেষ্টর বা তার সঙ্গের লোকজনের ক্লান্তি নেই। সমানে আমাদের মত হাঁটছে আবার লোকজনকে কাজে লাগিয়ে আমাদের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করছে। রান্না ভাল হয়নি বলে অনুযোগ করে অনেকে, তারা বোঝে না যে এরাও মানুষ।

'ম' বাবু সর্বদাই সন্ত্রস্ত। বাগনানের দিদিমার আচারের শিশিটা ভেঙ্গে দিয়েছে কুলীরা। ওঁর একটা মস্ত বড় সর্বনাশ হয়ে গেল, এমন-ধারা ওঁর কথার ভাব।

বড্ড পরিশ্রম হয়েছে আজ। নন্দগোপাল বাবু কিছু খেতে চাইলেন না। ওঁর মা জোর করে বলাতে উনিও উঠে কিছু মুখে দিয়ে নিলেন। ক্লান্তিতে অবশ সবাই।

আকাশের তারা জেগে রইল অতন্দ্র প্রহরীর মতো। জেগে রইল এই ধর্মশালার খুপরীগুলো আর ঝিমিয়ে পড়া মানুষ কম্বল মুড়ি দিয়ে নির্ভাবনায় তার কোলে ঘুমোতে লাগল। একজন কম। গালিব ফিরে গেছেন মেয়ের বিয়েতে উপস্থিত থাকবার জন্যে। রাত্রির নিস্তব্ধতা ঘুমের দেশের পরীকে আহ্বান করে আপন জনের মতো।

ভোরে নুরজাহানের কণ্ঠে সুন্দর আবৃত্তি শুনে ঘুম ভেঙে গেল। আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসতে শরীরটা বেশ ঝরঝরে মনে হতে লাগল। সমস্ত বেদনা, সমস্ত শ্রান্তি যেন কোন এক যাদুমন্ত্রে অন্তর্হিত হয়েছে। কর্মজীবনে যদি একদিন একটু বেশী পরিশ্রম হয়, তিনদিন লাগে সে পরিশ্রমজনিত ভোগান্তির উপশম করতে। অথচ এই পাহাড়পথে দিনের পর দিন, মাইলের পর মাইল চড়াই উৎরাই পার হয়ে ক্লান্ত হয়েছি ঠিকই, কিন্তু কুণ্ডে বা ঝরনার জলে অবগাহনের পর অথবা একটানা বিশ্রাম নেবার পরই সমস্ত অবসাদ দূর হয়ে গেছে। এখানকার আবহাওয়ায় এ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

অথবা এও হ'তে পারে, তুষারতীর্থপথে কোন যাত্রীই যেন ক্লিষ্ট না হয়, দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাতে এসেছে যে ভক্ত, সে যেন অবসন্ন হয়ে পথে পড়ে না থাকে, শরীর আর মন যেন সবল সতেজ থাকে, এই বোধ হয় ঠাকুরের অভিপ্রায়। কে জানে?

জংবাহাদুর এলো। অনেক কাজের মধ্যে আমাদের ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলা ওর কাজ। ও কি বলবে আমরা জানি। বলবে, 'এ বাবু উঠো, বিস্তারা বানো, সব কুলি চলা গয়া, জলদি করো বাবু'। রোজই সকালবেলা সে এই একই কথা বলে আমাদের। ভোরে ওঠেন অনেকেই। আমাদের মানে পঞ্চপাণ্ডবের গড়িমসি করে চটি থেকে বার হতে শেষপর্য্যন্ত বেলাই হয়ে যায়।

গুরুজী বলে, ওদের হ্যাণ্ডিক্যাপ দাও, আমরা মেকআপ করে নেব।

সবাই যে আমরা রোজ মেকআপ করে নিই এমন নয়। তবে আমাদের একজন না একজন সবার আগে পৌঁছে যায়।

কলে ভীড় লেগে গেছে।

গুডমর্ণিং তানসেন—বৌরাণী অভিনন্দন জানালেন।

গুডমর্ণিং। আপনার যে দেখি স্নান করা শেষ।

কি করব ভাই, সারাদিন তা নইলে বড় কষ্ট হয়।

তাই কি? না শুদ্ধাচার?

আমার অত আচার বিচার নেই।

নেই আবার! পাণ্ডারা কি আমাদের ছেড়ে আপনার পেছনে ঘুরঘুর করে শুধুশুধুই। ওরা জানে এমন নিষ্ঠাবতী, ভক্তিমতী—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে উনি বললেন, থাক। আর অত বলতে হবে না। এমনিতে পাণ্ডাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই, তারপর এসব কথা শুনলে একেবারে জোঁকের মত ধরবে।

বৌরাণী পা বাড়ান।

আজ আমরা তুঙ্গনাথ যাবো। খাড়া চড়াই। চড়াইয়ের নাম শুনেই অনেকের গায়ে জ্বর এলো। গাইডবুকের হিসেব তালগোল পাকিয়ে যায়। বই পড়ে মনকে প্রস্তুত করা এক জিনিষ আর পথে নেমে বাস্তব অভিজ্ঞতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মনকে তৈরী করা আর এক জিনিষ।

বেনিয়াকুণ্ড থেকে তুঙ্গনাথ তিনমাইল রাস্তায় প্রতি এক মাইলে প্রায় এক হাজার ফুটের ওপর উঠতে হবে। বেশীর ভাগ যাত্রীই ঘোড়ায় চেপে যাওয়া ঠিক করেন। অনেকে সোজা ভুলকোণায় নেমে গেলেন।

আবার চলল মানুষ আর ঘোড়ার ক্যারাভান। সুন্দর রাস্তা। জনি ওয়াকার ঘোড়ায় চেপে যেতে যেতে এদিক ওদিক যেই তাকাতে যাচ্ছেন, অমনি আনব্যাল্যান্সড হয়ে ঘোড়ার পিঠে হুমড়ী খেয়ে পড়ছেন। তাঁকে অসতর্ক হতে দেখে হাসিও পায়, দুঃখও হয়। কুমারডুবীর শ্রীকুমার আর আমি চলেছি আস্তে আস্তে একটা ষ্টেডী স্পীডে।

ধীরু বললে, আপনি তো খুব চালাক মশাই। তামসেনকে পাশে নিয়ে চলেছেন।

জবাব দিলেন কুমারডুবীর শ্রীকুমার, বরং ঠিক উল্টোটি। উর

পায়ে যে রকন ফোস্কা পড়েছে, একা ছেড়ে দিতে ভরসা হয় না। তবু তো আমরা পাশে পাশে আছি।

চুপ করে শুনে যেতে হয়। বলবার কিছু নেই।

বন আর জঙ্গল। পাইনের সারি যেন পথকে ঢাকা দিয়ে রাখতে চায়। পথের মানুষ যে আলোর পিছনে ছোটে, তা বুঝি তার অজানা থাকে। বাসপথ বা হাঁটাপথ যতটা অতিক্রম করেছি এমন সুন্দর দৃশ্য পাইনি কোথাও। পাহাড় আর পাহাড়।

সেদিন একটি বইতে পড়লাম, 'নারী, রং, পাহাড়, দূর হতেই বাহার'। পাহাড়েরা সুউচ্চ শির তুলে বুঝি দেখে আমাদের ক্রিয়াকলাপ। কখনও মেঘেরা চলে যায় মাথার ওপর দিয়ে আমাদের বিরাট সংসারটির খুঁটিনাটি দেখতে দেখতে।

অনেকটা ওপরে উঠে এসেছি। পথ চলতে শরীরের উত্তাপে ঠাণ্ডা ততটা লাগে না, কিন্তু একটু জিরোতে বসলেই শীত করে। তা করুক, চড়াই ভাঙ্গার ক্লান্তিতে আমাদের থামতে হয় মাঝে মাঝে। ঠাণ্ডা, গরম, ক্লান্তি, বিশ্রাম, পালা করে আসে। মাঝে মাঝে মুক্তোদাদা বলে ওঠেন 'লাভলি'।

প্রায় এসে পড়েছি, এক জায়গায় দেখি ডাণ্ডীওলা গোলমাল সুরু করেছে। সিলিক ঠাকুরমাকে নামিয়ে দিয়েছে। আরও ভাড়া বেশী না দিলে যাবে না। এ ভাবে যাত্রীদের বিপর্যযস্ত করা ওদের মধ্যে হামেশাই সুরু হয়েছে। মাঝপথে নেমে হেঁটে যাওয়া সম্ভব নয়, অন্য ডাণ্ডী ভাড়া করাও সম্ভব নয়, বাধ্য হয়ে তাই বেশী টাকা দিতে হয়।

সিলিক ঠাকুরমা বললেন, ওরা একটাকা মাইল হিসেবে রাজী হয়ে এখন পাঁচ সিকে করে চাইছে। কি অন্যায় বল দিকিনি, বাবা।

আমাদের বলাবলিতে কোন ফল হ'ল না।

গুরুজী বললে, তানসেন যদি এ কাহিনীটা লেখো, এ পয়েণ্টটা অবশ্যই উল্লেখ করো। লিখে দিও যাত্রীরা যেন বেশ করে দর ঠিক করে তবে ডাণ্ডীতে ওঠেন।

গুরুজীকে কথা দিয়েছিলাম বলেই এ পয়েন্টটা উল্লেখ করলাম।

যাত্রী আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। এরাও ক্রমশ সেয়ানা হচ্ছে। ভাল মানুষ দেখলেই জুলুম সুরু করে। নন্দগোপালবাবুর মা জানালেন তাঁর কাণ্ডীওলা রাস্তার মাঝখানে যেখানে সেখানে নামিয়ে দিয়ে হেঁটে যেতে বলে। ওদের কায়িক ক্লেশের জন্যে যাত্রীদের সহানুভূতি ওরা পায় ঠিকই, কিন্তু যাত্রীর দুর্ভোগ বাড়ালে এ সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হবে ওরা। অবশ্য ভাল লোকও আছে। যাত্রীর আরামের জন্যে, নিজের সুখসুবিধেকে হারাম করছে।

পা আর চলে না। থীরু চলেছে তার মাউথ অর্গানে হাল্কা সুর তুলতে তুলতে। দেশী ও বিদেশী গানের সুর ভালই লাগছে শুনতে। মধ্যম পাণ্ডব আর বি.বি.সি একটা পাথরের ওপর বসে জিরোচ্ছেন। আমার বেঁকে বেঁকে হেঁটে চলা ওদের হাসির উদ্রেক করে। মাথায় টুপি পাহাড়ী যুবক মাথা নেড়ে তাল দিচ্ছে বাজনার সঙ্গে। এক এক করে ঘোড়াওলারা আমাদের পেরিয়ে গেল।

এম.পি. শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, ঘোড়ায় চাপাও দুর্ভোগ। কোমরটা যে গেল।

আমি বলি, বেশ তো ঝান্সীর রাণীর মত দেখাচ্ছে।

রোদ চড়া হয়েছে, তবু মিষ্টি লাগছে। কলকোলাহলমুখরিত নগর ছেড়ে ছায়াঘেরা এই বিজন পথে ভালই লাগছে হাঁটতে! তুঙ্গনাথে পৌছুতে আর একটু বাকি আছে।

সামনে একটা পথ একেবারে সোজা ওপারে চলে গেছে অনেকখানি। ওটাই আকর্ষণ। ওই পথ ধরে চলতে চলতে আমি একসময় পথটাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাব, এটা ভাবতেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। বাস্তবিক, এটুকু রোমান্স না থাকলে সমস্ত জার্ণিটাই যেন বিফল।

বেলা দশটা নাগাদ তুঙ্গনাথে এলাম। চটির স্যাঁতসেতে ঘরে নয়, চটির সামনের চওড়া চাতালে পা ছড়িয়ে রোদ পোহাতে বসি।

মনে পড়ে যায় ছেলেবেলার কথা। শীতের দুপুরে বাড়ীতে ঠাকুরমাকে দেখেছি দালানে পা ছড়িয়ে বসতে। মা, পিসিমা, কাছে বসে তাঁর সেবা করতেন। আমাদের আর কে সেবা করবে। নিজেরাই নিজের গা হাত পা টিপি।

এলাহাবাদের পিসিমা গল্প সুরু করেন কামাখ্যা, কাশী বৃন্দাবনের। গল্প শুনতে শুনতে এপাশ ওপাশ চোখ ফেরাই। বারহাজার বাহাত্তর ফুট, চাট্টিখানি কথা নয়। চটিতে বিশ্রাম নিতে নিতে বাকী সবাই এসে পড়লেন।

চটি থেকে মন্দির বেশ খানিকটা উঁচুতে ও দূরে। খালি পায়ে ঠাণ্ডা কনকনে মেঝের উপর দিয়ে দেবদর্শনে চললাম আমরা। একহাতে পূজার উপকরণ, অন্যহাতে ক্যামেরা।

যাঁরা তুঙ্গনাথের পথে এলেন না, তাঁদের জন্য আফশোষ হতে লাগল। হাজার হোক, একই পথের পথিক তো বটে। রসগোল্লাদা আসতে পারবেন না, এটা ভাবিনি। বোঝা গেল, রসগোল্লার টিন কিছু নয়, মনের ভক্তিরসই আসল।

আর আসল রসের রসিক যিনি, সকল রসের রসিকচূড়ামণি যিনি, আমাদের ভক্তিরস কতটুকু আছে পরীক্ষা করবার জন্যেই বুঝি এমন নিভৃতে আস্তানা গেড়েছেন। ভক্তের ভগবান তুমি, ভক্তকে ছেড়ে যাবে কোথায়! কত পরীক্ষা করবে, কত বাধা উপস্থাপনা করবে, তোমাকে যে কাছে পেতেই হবে ঠাকুর। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন'। তুমিই যে রূপের আধার। যে আসতে পারল না, তোমাকেই যে তার কাছে যেতে হবে।

মূলমন্দিরে হরি ও হরের অভেদমূর্ত্তি। আর আছেন গণেশ, পার্বতী, অন্যান্য দেবদেবী। পাণ্ডাটি সজ্জন এখানকার। ঘটা করে পূজো দিলেন বৌরাণী, রাণুদি ও আরও অনেকে।

মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে 'ম' বাবু বললেন, আমাদের টীমে এমন ডাক্তার বলতে আপনি, জানতেন গুলি ঠিক আছে তো।

জবাব দিলাম, কিছুই ভাববার নেই, এক গুলিতে বাজীমাৎ।

মন্দির থেকে বেরিয়ে সামনের ছোট টিলার ওপরে গিয়ে বসি। একজন সাধারণ নিম্ন মধ্যবিত্ত করণিকের চোখ দিয়ে চতুর্দ্দিকে তাকিয়ে দেখি। এই তুষারশুভ্র পাহাড়ের শোভা, এই সুবিস্তৃত অরণ্যানী, এরা আমার নিত্য অভাবের চাপে পীড়িত মনকে কত সহজে ভুলিয়ে দিতে পারে। অভাব, প্রয়োজন, দুঃখদারিদ্র্যের সংসারের বাইরেও যে আর একটা জগৎ আছে, তা এখানে না এলে ভাবতেই পারে না মানুষ। মানুষে মানুষে এত ভালবাসা, তা বুঝি এখানেই সম্ভব।

দিগন্ত যখন বহুবিস্তৃত, আমাদের আসন তখন নিশ্চয়ই সুউচ্চে। ইচ্ছা হয় ছুটে চলে যাই ওইখানটায়, যেখানে আকাশ নেমে আসে পাহাড়শীর্ষকে চুম্বন করতে। মনটা রোমান্টিক হয়ে উঠছিল, বাধা পেল বোষ্টমাসীর কথায়।

বললেন, দেখতো বাবা, তখন থেকে লোকটা পাকিস্তান পাকিস্তান করছে।

কাছে গিয়ে শুধোই কি তার বক্তব্য। তার জবাব শুনে হেসে বাঁচি না। পাণ্ডারই এ্যাসিষ্টান্ট সে। পাণ্ডার কথামতো আমাদের অনুরোধ জানাতে এসেছিল 'পাকস্থানে' অর্থাৎ খাবার ঘরে গিয়ে জলযোগ সেরে নেবার জন্য। পাকিস্তানে নয়, পাকস্থানে জলযোগ সেরে নিই সবাই।

পিংখাড়ু আর থীরু দলছাড়া হয়েছে। থীরু মেটাচ্ছে তার রোলিফ্লেক্সের ক্ষুধা আর পিংখাড়ু বিশুদ্ধ হিন্দীতে স্থানীয় লোকদের সঙ্গে আলাপ জমাতে ব্যস্ত। এরা বারোমাস কিভাবে থাকে সেটা জানবার আগ্রহ পিংখাড়ুর যত, তার চেয়ে বেশী আগ্রহ ওদের, কলকাতা শহর কি রকম সেটা জানবার জন্যে।

আকাশ একটু পরিষ্কার হতেই পাণ্ডা দেখিয়ে দিলে বরফের চাদরের আবরণ দেওয়া গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, ৺কেদার ও ৺বদরী

পাহাড়ের চূড়ো। এ যাত্রায় গঙ্গোত্রী যমুনোত্রী যাওয়া হবে না, তাই এখান থেকেই প্রণাম জানাই।

থীরু আর পিংখাড়ু ফিরে আসতেই যাত্রা সুরু হল। জন গিলপিন 'ম' বাবুর সঙ্গে ঘোড়াওলাকে দেয় টাকা নিয়ে হিসেবে ব্যস্ত। ঘোড়াওলা টাকা নিতে রাজী হচ্ছে না আর ঘোড়াটা চিঁহি চিঁহি করে ডেকে বুঝি প্রভুকে সায় দিচ্ছে।

এবারে আর কোন বাহন নয়। যেমন উঠে আসা হয়েছে, পাহাড়ের উল্টোদিকে তেমনি নেমে আসতে হবে।

জনি ওয়াকার হঠাৎ বলে বসেন, এবারে সবার অধঃপতন—বলে নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে ওঠেন।

আঁকাবাঁকা পথে লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছি সবাই। মধ্যম পাণ্ডব আর চট্টি চ্যাটার্জ্জী দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমরা ষ্টেডী স্পীডে চলেছি।

'ম' বাবু দূর থেকে ভুলকোনা চটি দেখিয়ে দিলেন—আমাদের দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রাম স্থান। দেখতে পেলে কি হবে, পথ যে ফুরোয় না। যদি একলাফে লাফিয়ে যেতে পারতাম! দূর, এ কি ছেলেমানুষী!

ঝরণার পাশ দিয়ে রাস্তা নেমে গেছে। এখানটায় মাথার ওপর আকাশ দেখা গেল অনেকক্ষণ পরে।

ছোট চাট ভুলকোনা—এর চারপাশে বড় বড় পাথরের চাঁই।

পেছন দিকে তাকিয়ে টারজেনের ডাক দিতে প্রত্যুত্তর এল—অশরীরী প্রত্যুত্তর কোন মানুষের দেওয়া নয়। প্রত্যুত্তর দিল প্রতিধ্বনি।

ভুলকোনায় খাওয়াদাওয়া সেরে আবার হাঁটতে হবে। রওনা হবার তোড়জোড় হচ্ছে। খেতে তো বেশী সময় লাগে না।

রওনা হবার আগে পাথরের উপর বসে ডায়েরী লিখতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় গজলের সুর কানে এল। বঙ্কুদা গুণগুণ করে সুর ভাঁজছেন। সুর শুনে কথা দিই তাতে।

ভুলকোনাতে, সবারি সাথে, দিল লাগাতে, চাইগো চাই।
সবাই মিলে, দরিয়া দিলে, দরদ ভুলে, গান যে গাই।
খুশীর আলো, প্রাণেতে জ্বালো, লাগবে ভালো, জেনো সবাই।
রংবিলাসী, উছলহাসি, ভাল যে বাসি, সবে শুনাই।

গানের কথায় হেসে ওঠে সবাই। একটু প্রাণখুলে হাসতেই তো আসা। ঘোড়া কাণ্ডী, ডাণ্ডীওলারা আবার এখান থেকে যাত্রী পেলো। সুরু হল পথ চলা। রাঙাদি, এম. পি, বেশ গল্প জুড়েছিলেন। আমাদের তাড়া খেয়ে উঠে পড়েন।

শিবপুরের মামীমা বললেন, এত যে গাছ বাবা, কই আমগাছ তো তেমন চোখে পড়ল না।

তারপর দেশের বাগানে আমগাছ নিয়ে জ্ঞাতিদের সঙ্গে লাঠালাঠির কথা শোনালেন। গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে শিবপুরের মামীমার গল্প শুনতে শুনতে চলেছি। শ্যাওলাপড়া পিচ্ছিল পথে বেশ সাবধানে পা ফেলতে হচ্ছে।

জংবাহাদুর আর অন্যান্য কুলীদের দেখি এক এক জায়গায় বিশ্রাম নেয়, জটলা করে, গাঁজা খায়। ওদের জিজ্ঞাসা করলে বলে 'তামাক খাচ্ছি'। গাঁজার দমে কিন্তু ওরা আসুরিক শক্তি পায় ওদের দেহে, ঠিক যেমন আমাদের দেহে আসে উত্তেজনার শক্তি, থীরুর মাউথঅর্গান আর গুরুজীর 'চল বেটা' ডাক শুনে।

বনগোলাপের ঝাড় পেছনে পড়ে থাকে, পেছনে পড়ে থাকে ঝরণা। আমরা চলতে থাকি একটু একটু করে। আমার সামনেই বৌরাণীর ঘোড়া। পথের পাশে পাশে ছোট কুঞ্জবীথিকা। মাথার ওপর প্রজাপতি।

বৌরাণী বললেন, দোব না কি শাঁখ বাজিয়ে।

অমন কাজটি করবেন না। খাওয়াটা মাঠে মারা যাবে। তাছাড়া এখান থেকে ওই নাকে নথপরা গায়ে কম্বলের জামাপরা

মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে গেলে আপনারই অসুবিধে। পারবেন ওকে ভাজ বলে পরিচয় দিতে—সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিই।

আপনি যদি বিয়ে করতে পারেন, আমিও পারব তাকে ভায়ের বউ বলে মেনে নিতে। কম্বল খুলে নাইলন চাপাতে আর কতক্ষণ!

এখন বলছেন, পরে দেখব ভাজ না হয়ে সে হয়েছে অপ্রিয়ভাজন। আর তখন আমার হাড় ভাজাভাজা হবে। তার চেয়েও এই বেশ আছি।

ওদের দেশে ওদেরই নিশ্চিন্তে নিন্দে করছেন।

নিন্দে করব কেন। সঞ্জীবচন্দ্রের ভাষায় প্রশস্তি, বন্যেরা বনে সুন্দর।

ভুল হল। বলুন পাহাড়ীরা পাহাড়ের কোলে।

ওঁর ঘোড়াকে পেছনে রেখে হনহন করে পা চালিয়ে এগিয়ে যাই। জনমনিষ্যি নেই, গা ছমছম করে। পাতায় পাতায় সরসর শব্দে নিজেরাই চমকে উঠি। শোনা গেল বন্য জানোয়ার মোলাকাত করতে আসতে পারে। আমি তো নীচেলোহাবসানো লাঠিটাকে পাথরের ওপর জোরে ঠুকে আওয়াজ করতে করতে চলেছি।

মুক্তোদাদা বললেন ভেঙ্গে যাবে যে!

জবাব দিলাম, ভয় ভাঙ্গাতে গিয়ে লাঠিটা ভেঙ্গে যায় যাবে।

অন্য লাঠি পাবেন কোথায়।

গাছের ডাল ভেঙ্গে নেবো।

ঠকঠক করে লাঠির আওয়াজ চলে। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়ে আসছে। দূর থেকে টারজেনের ডাক শোনা যাচ্ছে। চট্টি চ্যাটার্জী ছাড়া এমন জোর গলা আর কার! গলা ফাটিয়ে প্রত্যুত্তর দিই। আবার এল ডাক—এবারে আওয়াজটা এল ক্ষীণ।

গুরুজী বললে, ওরা তাহলে খুব এগিয়ে গেছে।

একটা কথা চকিতে আমার মনে এলো। গুরুজীকে বললাম, ওরা পথ হারিয়ে যায়নি তো। আওয়াজটা যেন জঙ্গলের দিক থেকে এল মনে হচ্ছে।

ধ্যেৎ কি যে বল। একই পথ।

ওরা কিন্তু বলাবলি করছিল খাবার সময়, আজ ওরা পাকদণ্ডী পথে যাবে। জঙ্গলে বোধ হয় পথ ঠিক করতে পারেনি।

একটু ভেবে গুরুজী বললে, তা বোধ হয় হতে পারে। তাহলে তুমি এক কাজ করো, সারারাস্তা টারজেনের ডাক দিতে দিতে চলো।

গুরুজী আর আমি সারারাস্তা পালা করে ডাক দিতে দিতে যাই। কখনও ওদের গলার স্বর ভেসে আসে গাছের সারির আড়াল ভেদ করে, কখনও হারিয়ে যায়।

সন্ধ্যে নাগাদ মণ্ডল চটিতে এসে পড়ি। এসেই ওদের খোঁজ নিয়ে দেখি ওরা এসে পড়েছে আগেই। যাক, মস্ত একটা ভাবনা থেকে রেহাই পেলাম। আমাদের অনুমান মিথ্যে নয়। ওরা পাকদণ্ডী পথেই এসেছে।

ওদিকে আর এক কাণ্ড। বৌরাণী ছাড়া সবাই এসে পড়েছে। একজন জানালেন যে তাঁকে ঘোড়া থেকে পড়ে যেতে দেখেছেন। ঘোড়াটা ছিল বেতো, নিজেই চলতে পারে না, সওয়ারীকে বইবে কি ; শেষে কাণ্ডী পাঠিয়ে তাকে নিয়ে আসা হল। 'ম' বাবুকে দুকথা শোনাতে ছাড়লেন না অনেকে। পঞ্চপাণ্ডব 'ম' বাবুকে সময়মত কিছু সৎ পরামর্শ দেয়।

মণ্ডল চটিতে রাত্রিবাস। আজ প্রায় মাইল দশেক হাঁটা হয়েছে। ক্লান্ত শরীর এলিয়ে দেয় কেউ কেউ। তাস নিয়ে বসেন কুমারডুবীর শ্রীকুমার বাবু, দলে এলেন ডাক্তারবাবু, খদ্দরের সার্ট, পিংখাড়ু। হিসেব লিখতে বসল গুরুজী, চিঠি লেখে চট্টি চ্যাটার্জী, ডায়েরী নিয়ে বসি আমি আর খীরু ও মধ্যমপাণ্ডব ক্যামেরাতে আজ সারাপথে কি পেয়েছে তার আলোচনায় মগ্ন হল।

ভোর হয় প্রতিদিনকার মত। আলোর আগমনবার্তা পেয়ে আঁধার লুকোয় আড়ালে। আবার সাজ সাজ রব পড়ে যায়। বিছানা

বাঁধাটা এতদিন নিজেই করেছি। সবাই তাই করে। আজ থেকে এ ভারটাও জংবাহাদুরকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হই পুরোপুরি।

পথে নামি। ছোট্ট একটা নদী পেরিয়ে এপাশে আসা হল। নদীটির নাম বালখিল্য গঙ্গা। গাড়োয়ালীদের ছোট ছোট ক্ষেত চোখে পড়ে। মাইল চারেক রাস্তায় বেশী চড়াই উৎরাই নেই, আবার স্থুরু হল চড়াই। মাথার ওপর ধাঁ ধাঁ করছে রোদ। দেড় মাইল চড়াই ভাঙ্গতে হাঁফিয়ে উঠি।

রাজস্থানীদের একটি দল পথের ওপর বসে পড়েছে। ওরাই সত্যিকারের পথিক। চটির পরোয়া করে না। ছোট ছোট মোট নিজেরাই বহন করে। পথের ওপরই স্থুরু হয় গৃহস্থালী। শ্বশুর, ভাস্থর, ননদ ভাজ সব একসঙ্গে হাতে হাতে কাজ করে। পুরুষদের মাথায় পাগড়ী, গায়ে ফতুয়া, হাঁটুর ওপর কাপড়। মেয়েদের গায়ে কাঁচুলি, পরণে রঙীন ঘাগরা, ভারী ভারী রূপোর গয়না।

আলাপ করে জানতে পারি এরা চাষী। ধান কাটা শেষ করে মানবজমীন আবাদ করতে বেরিয়েছে। ওদের মনের পতিত জমিতেই সোনা ফলবে। যে সোনা ওরা মাঠে ফলায় তার চেয়েও বহুমূল্য সোনা পাবে ওরা। ওদের মনই বুঝি কৃষিকাজ জানে।

গোপেশ্বরে বিশ্রাম। তেমন ঠাণ্ডা নেই। তুদিন স্নান সারা নেই। বেশ করে তেল মেখে চললাম কলের দিকে। ভীষণ মাছি গোপেশ্বরে। অত মাছি আমি একসঙ্গে কখনও দেখিনি। পথে অবশ্য কয়েক জায়গায় মাছি পেয়েছি, এ যেন মাছির বন্যা। কামড়ালে ঘা হয়ে যায়। ওদের গুঞ্জনে এক বিচিত্র কনসার্ট।

মন্দির দর্শনে যাওয়া হল দল বেঁধে, সঙ্গে চলল মাছি। শিবের মন্দির। মন্দিরের পবিত্র পরিবেশ নেই। কেমন যেন নোংরার মাঝে উপাসনার গৃহ। মন্দিরের মাঝে প্রকাণ্ড চাতাল, পাথরে বাঁধানো। একপাশে ছোট ছোট ঘর। শিবমন্দিরের সামনে মস্তবড় এক ত্রিশূল, দেওয়ালের গায়ে ঠেসান দিয়ে দাঁড় করানো। শুনলাম

দ্বাদশ শতাব্দীর মহারাজা অনেকমল্লের বিজয় গৌরবের কথা খোদিত আছে এতে। ইতিহাসের ছাত্ররা নীরব কেন? নাম শুনেছো এর?

ত্রিশূলের মাঝামাঝি এক বিরাট কুঠার দেখিয়ে একজন বললেন, 'এটি পরশুরামের'।

এদিকে ওদিকে আরও অনেক শিলামূর্ত্তি।

কয়েকটি নিতান্ত শিশু হঠাৎ আমাদের কাছে এসে গম্ভীরভাবে বলতে সুরু করে 'ইয়ে ভৈরবনাথ হ্যায়, ইয়ে গনেশজী হ্যায়' ইত্যাদি। বলা শেষ হলেই পয়সা চেয়ে বসে। তাই দেখে কোথা থেকে একজন ছুটে এসে ওদের ধমক লাগাল। ধমক খেয়ে তারা পালিয়ে বাঁচে। এদিকে গৈরিকবসন পরিহিত সেই লোকটি ততক্ষণ সুরু করেছে 'ইয়ে ভৈরবনাথ হ্যায়, ইয়ে গণেশজী হ্যায়,' ইত্যাদি।

বোঝা গেল ইনিই মূল পাণ্ডা। ছোট ছেলেরা ওর অধিকারে হস্তক্ষেপ করেছিলো বলে বকুনী খেয়েছে। লোকটি তার প্রাপ্য নিয়ে চলে যেতেই আবার এল বাচ্চাদের দল। তাদেরও কাউকে কাউকে পয়সা দিলাম। জন গিলপিন, পিংখাড়ু, নুরজাহান ও জাহাঙ্গীর এবং আরও কেউ কেউ গেলেন বৈতরণীকুণ্ডেও স্নান করতে।

ফিরে এসে বসি চটিতে। টাটকা পেঁড়া তৈরী হচ্ছিল, কড়াশুদ্ধ কিনে নেওয়া হল।

পেঁড়া খেতে খেতে দিদিমণি বললেন, তানসেনের হাতে কালো গ্লাভস্ কেন।

গ্লাভস্ নয়, মাছির ঘন আস্তরণ।

পাখার বাতাস করতে করতে বলি, ওরা আদর কাড়াচ্ছে।

মুক্তিবৌদি বললেন, সগর রাজার ষাট হাজার ছেলে যদি বাপের বুকে বসে একসঙ্গে আদর কাড়ায়, তার অবস্থাটা কেমন হয় আঁচ করছি আপনাকে দেখে।

ওঁর কথায় হাসির ঢেউ ওঠে। বৌরাণী ফিরলেন মন্দিরে পূজো সেরে। নিয়ে এলেন প্রসাদ সকলের জন্য আর নিয়ে এলেন মাছি।

কখন যে খাওয়া হবে! খেয়ে এ স্থান ত্যাগ করতে পারলেই যেন বাঁচি। গুরুজী একটা গামছা সর্বাঙ্গে ঢেকে বসে আছে। গামছার ওপর মাছি বসে গামছার লালরংকে কালো করে দিয়েছে।

তাই দেখে বললাম, মানুষ মরে গেলে মুখে মাছি বসে, কিন্তু সে মাছিকে তখন সে দেখতে পায় না। এখন চোখ পিটির পিটির করে গুরুজী দেখে নিচ্ছে ব্যাপারটাকে।

গুরুজী বললে, পেখনু পিয়ামুখ চন্দা।

বিশ্রামের অবসরে একটার পর একটা কথা এসে পড়ে। কথা হচ্ছিল কি করা উচিৎ আর কি নয়, এই নিয়ে।

গুরুজী বললে, চানের কথায় এইটুকু বলতে পারি যে, করব কি করব না ভেবে, না করাই উচিৎ।

রাঙাদি বললেন, হাঁটার কথায় বলা চলে, হাঁটব কি হাঁটব না ভাবতে বসে, অবশেষে হাঁটাই উচিৎ!

'ম' বাবু বললেন, খাওয়ার কথায় বলতে পারা যায়, খাব কি খাব না ভাবতে গিয়ে শেষে না খাওয়াই উচিৎ।

সমস্বরে প্রতিবাদ উঠে, তা তো বটেই। ও কথা বললে শুনছে কে, ক্ষিদেয় যে পেট জ্বলছে।

ঠিক সেই সময় বটকেষ্ট জানিয়ে গেল খাবার তৈরী হয়েছে।

মাছির কোটিং দেওয়া ভাত খেতে খেতে কুমারডুবীর শ্রীকুমার বললেন, ডাক্তারবাবু প্লিস্ বি রেডী, কিসমিসের মত কয়েকটা যেন চলে গেল পেটে।

আমাকে কেন, তানসেন তো পাশেই রয়েছেন।

থীরু বললে, এরা চিকেনজ্যুস খাওয়া মাছি, কোন দোষ নেই।

বোষ্টমাসী তাই শুনে কানে হাত চাপা দেন।

মুক্তোদাদা বললেন, যাত্রাপথে এসব আবার কেন। নামোচ্চারণ করাও ঠিক নয়।

গুরুজী বললে, পাচ্ছে কোথায় যে চিকেন খাবে।

…মন্দির দর্শনে যাওয়া হল দল বেঁধে—পৃঃ ১১০

…চটি থেকে মন্দির বেশ খানিকটা উঁচুতে—পৃঃ ১০৪

...অনেকটা জায়গা জুড়ে মন্দিরের অবস্থিতি—পৃঃ ৬৬

মধ্যম পাণ্ডব বললে, আর যদি খেয়েই থাকে কেউ, সেটা কি দোষের না কি।

চট্টি চ্যাটার্জী বললে, সারারাস্তা নিরামিষ খাওয়ার কোন মানে হয় না।

বৌরাণী বললেন, আহা বেচারীরা। মুরগীর শোক যেন বড্ড বেশী লেগেছে আপনাদের!

চট্টি চ্যাটার্জী বললে, বলতে পারেন, যাঁরা বিকেলে কালীঘাট যান, তাঁরা কি সবাই সারাদিন উপোষ করে থাকেন। সকালে মাংস খেয়ে বিকেলে দক্ষিণেশ্বরে যান না কেউ ?

মুক্তোদাদা আলোচনা পেড়েছেন। বললেন, কথাটা তা নয়, মানে,—

গুরুজী বললে, মানেটা সোজা। সংযম ভাল, তবে সংযমের নামে কৃচ্ছ্রসাধনটাও ঠিক নয়। আত্মা যখন আছে, তাকে নিগ্রহ করা ঠিক নয়। তাছাড়া কে খেলে কে না খেলে, কে শুদ্ধাচারী, কে ম্লেচ্ছ, তা নিয়ে আমাদের দরকার নেই।

বৌরাণী বললেন, দেবদর্শনে এসে তুদিন আর আমিষ ত্যাগ করা যায় না।

চট্টি চ্যাটার্জী বললে, ত্যাগ তো করেছি। তর্কের খাতিরে বলতে হল।

এ তর্কের কি মীমাংসা হয়। তর্কটা হয়ত আরও কিছুদূর চলতো, মাছির উপদ্রবে উঠে পড়ল সবাই।

গোপেশ্বর থেকে মাইল তুয়েক সমতল শেষে চামৌলীর কাছে মাইল খানেক উৎরাই। পথের পাশে ডালিম, আখরোট আরও কত গাছের সারি। দূরে পাহাড়ের চূড়ো দেখা যাচ্ছে একটি তুটি। ধুলোমাখা পায়ে এগিয়ে চলি।

পাহাড়ী গ্রাম একটি তুটি চোখে পড়ে। নাকে নথ গৃহস্থ বধূ আমাদের মুখোমুখি পড়লে থমকে সরে দাঁড়ায়।

অলকানন্দার এপার থেকে ওপারের পি. ডবলিউ. ডি. বাংলো দেখা যাচ্ছে। যারা আমাদের আগে পৌঁছেছে, তারা রুমাল নেড়ে স্বাগত জানাচ্ছে। আমি ছাতা উঁচিয়ে সাড়া দিই। টারজেনের ডাক দেবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু অলকানন্দার কলস্বরকে ছাপিয়ে সে শব্দ তো ওপারে যাবে না। বেশ ভাল লাগছে। নদীর তুপারে তুজন, চেনা জানা আপন লোক।

কদিন পরে আবার বাসে চাপা হবে। বাসে চেপে যাওয়ার আনন্দ বা তুর্ভোগ যাই বলা যাক না কেন, পেয়েছি। সারিবন্দী বাসগুলো যখন যায়, তখন কেমন দেখতে লাগে সেটা এ পার থেকে দেখি। বেশ খানিকটা ধুলোয় ঢাকা খোয়া ছড়ানো পথে হোঁচট খেতে খেতে নীচে নেমে পুল পেরিয়ে তবে অপর পারে গিয়ে পৌঁছুই। তখন বিকেল চারটে হবে।

বেশ বৰ্দ্ধিষ্ণু জায়গা চমৌলী। এর আর এক নাম লালসাঙ্গা। মাইলপোষ্টে লেখা আছে চমৌলী থেকে ৺কেদারনাথ চুয়ান্ন মাইল, ৺বদরীনাথ সাতচল্লিশ মাইল, হরিদ্বার একশ পঁয়ত্রিশ মাইল। এটি হচ্ছে ৺কেদারবদরী এবং রুদ্রপ্রয়াগ. কর্ণপ্রয়াগ ও ৺বদরীর মিলন স্থান। হৃষিকেশে রওনা হয়ে সোজা বাসপথে এখানে আসা যায়। দোকান বাজার, পোষ্টাফিস, ইত্যাদিতে জমজমাট জায়গা। হেন জিনিষ নেই, যা পাওয়া যায় না, মায় মাছ মাংস শুদ্ধ। (আমিষ ভোজী যাত্রীর সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে, তাই সেইমত ব্যবসায়বুদ্ধি খোলে দোকানদারের।)

ধরো জুতো ছিঁড়ে গেছে, সোয়েটার হারিয়ে গেছে, মিছরী মেওয়া ফুরিয়েছে, ব্যাটারী শেষ হয়ে গেছে, সব কিনতে পাবে। ধর পয়সা ফুরিয়েছে—নাঃ, ওটি পাবে না। ওটার জন্য বাড়ী থেকে টি. এম. ও'র প্রতীক্ষা করতে হবে।

উখীমঠ থেকে একটি গুজরাটি পরিবার আমাদের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন। পুল পেরিয়ে এদিকে আসতে আবার দেখা হল ওঁদের

সঙ্গে। ওঁদের পরিবারের অল্পবয়সী মেয়েটির বাচালতা সময় সময় ছাড়িয়ে যাচ্ছিল শালীনতার সীমা। পুরুষদের যা শোভা পায়, মেয়েদের তা শোভা পায় না। অনেক মহিলাই ঘোড়ায় চেপেছেন কিন্তু তার মতো ও রকম বেয়াড়াভাবে পা নাচাতে দেখিনি কাউকে। দু পা করে ঘোড়া এগুচ্ছে আর ফিক ফিক করে হাসছে আমাদের নেচে নেচে চলার ভঙ্গী দেখে।

গুরুজী বললে, গতিক ভাল নয়, তানসেন।

তুমি থীরুকে সামলাও। তোমার ওই কেষ্টঠাকুরটি বাঁশী বাজিয়েই শেষে না বাজী-মাৎ করে।

তুমি কি ক্ষেপেছো। আমি রইছি কি করতে। তোমাদের চিনি তো। সাধে কি আর তোমাদের দলে নিয়েছি।

পঞ্চপাণ্ডব আর যাই হোক, ওসব ব্যাপারে পাদমেকং ন গচ্ছন্তি।

আধুনিক প্যাটার্ণে নির্মিত সুন্দর পি. ডবলিউ. ডি বাংলোতে চেনা লোকদের খুঁজে পেতে দেরী হল না। এখানে ঘণ্টাখানেকের জন্য বিশ্রাম এবং যাঁরা তুঙ্গনাথে যাননি, তাঁদের সঙ্গে পুনর্মিলন। গুরুজীকে ওখানে বসিয়ে রেখে আমরা আবার পুলের ওপর যাই ছবি তুলতে। ফুরফুরে হাওয়ায় শরীরটা স্নিগ্ধ হয়। কিছু লোক তখনও এসে পড়েন নি। সিলিক ঠাকুরমার ডাণ্ডী এল।

'ম' বাবু ছুটোছুটি করছেন গাড়ীর জন্য। যদি বাস পাওয়া যায়, তবে এখান থেকে সোজা পিপলকোটিতে গিয়ে রাত্রিবাস। বাস পাওয়া গেল। খানিকপরে এক এক করে সবাই এসে পড়তেই বাসের ভিতর গিয়ে বসি সবাই। কুলীরাও একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

চমৌলী থেকে পিপলকোটি দশ মাইল। খানিকটা সমতল, শেষের দিকে চড়াই। বাস চলেছে দুলতে দুলতে। থীরুর মাউথ-অর্গানে সুর ওঠে বেজে।

মুক্তোদাদা বললেন, 'জয় বদরীবিশাল কি জয়'।

সমস্বরে বলি আমরা, 'জয় বদরীবিশাল কি জয়'।

নন্দগোপালবাবুর মা বললেন, ৺কেদারনাথের জয়ধ্বনিও দাও।

সমস্বরে রব ওঠে—'জয় কেদারনাথজী কি জয়'।

শুধুই পাথর। আজ কদিন ধরে কেবল গাছপালা, পাথর, জল আর বরফ দেখছি। নেই গগনচুম্বী প্রাসাদ, নেই ইলেকট্রিক ট্রেণ, নেই হিন্দী সিনেমার রোমাঞ্চোদ্দীপক পোষ্টার। শহুরে লোক ক্ষুদে শহর দেখেই তৃপ্ত। ক্ষুদে শহর চমৌলী ছেড়ে আর একটা ক্ষুদে শহর পিপলকোটিতে পৌঁছুতে সন্ধ্যে হয়ে গেল।

ঠিক নামবার মুখে বৃষ্টি এল। বাসের আড্ডা এখানে। কত বাস! বেশ সমৃদ্ধস্থান এই পিপলকোটি। একেবারে গমগম করছে লোকজন। ষ্ট্যাণ্ডের কাছেই অনেক দোকান। এখানেও হোটেলে মাংস পাওয়া যায়, তবে সন্ধ্যের পরে। লুকিয়ে লুকিয়ে বেচে ওরা। আহা, কি পথের মহিমা রে!

পশুর চামড়ার আসন, চামর, কম্বল শিলাজিতের দোকান আর খাবারের দোকান পাশাপাশি সাজানো। একটা দোকানে রেডিওতে সিলোন রেডিওর গান হচ্ছে।

বাস ষ্ট্যাণ্ড থেকে চটিটি বেশ একটু দূরে। পায়খানাটি আবার চটি থেকে প্রায় এক ফার্লং দূরে।

পায়ে ফোস্কা পড়েছে আমার। থীরু প্লাষ্টার লাগিয়ে দিল।

কুমারডুবীর শ্রীকুমার বললেন, আপনাকে একটু শুকনো দেখাচ্ছে।

বলি, কেন ভালই তো আছি।

তাই যেন থাকেন ভাই—বলে নিজের ঘরের দিকে গেলেন তিনি।

এই যে সমবেদনা প্রকাশ, এই যে মমত্ববোধ, এটা যদি থাকে আমার প্রতি অন্যলোকের, তা হলে মনে হয় আমি একা নই। আমার ভ্রমণ তালিকায় ৺কেদারবদরী নামটা সংযোজনা হয়। সেই সঙ্গে অভিজ্ঞতার ঝুলিতে সংযোগ হয় অনেক কিছুই। বাড়ে বন্ধুত্বের আসরে লোকের সংখ্যা। কত লোক কত কথার কথকতা শোনায়।

এবেলা আমরা একটা বড় ঘরে ঠাঁই পেয়ে আহ্বান করি অন্যান্য যাত্রীকে, কিন্তু দল ছেড়ে আসতে চায় না কেউই।

দল নিয়ে দলাদলি, অথচ এই দলপ্রীতি সহজেই গড়ে ওঠে। আমার কথা যে ভাবে, তার কথাও যে আমাকে ভাবতে হয়। সে আর আমি দল তৈরি করি। তাতে যোগ দাও তুমি। ব্যস্, হয়ে গেল তুমি, সে ও আমির দল।

যৌবনের সীমা পার হননি যিনি, তিনি কেন যাবেন প্রৌঢ়ের দলে। যুবা বয়সেব দিকে ফিরে তাকান না যে জন, তিনিই বা যুবকদের সঙ্গে ভিড়ে যাবেন কেন?

অথচ মুক্তোদাদা, বি-বি-সি, বঙ্কুদার মত লোকও আছেন, যাঁদের চুলে পাক ধরলেও মনটা নবীন। বয়সের গণ্ডীকে অস্বীকার করে সবার সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলতে পারেন। পঞ্চপাণ্ডবের কথা না-ই বা ধরলাম।

নন্দগোপালবাবুও একটু প্লাষ্টার চেয়ে নিয়ে গেলেন।

চট্টি চ্যাটার্জী বললে, কেনই বা প্লাষ্টার করা, পাথরে হোঁচট খেয়ে কোথায় উড়ে যাবে।

থীরু বললে, ফাটা কপালে লাগিয়ে দিলে জোড় লেগে যায়, যে সে জিনিষ নয়।

বঙ্কুদা বললেন, সেটা আবার কি মশাই।

গুরুজী বললে, চেপে যাও বঙ্কুদা।

বঙ্কুদার আর জানা হল না।

পরদিন বেশ বেলা পর্য্যন্ত বিছানায় শুয়ে থাকি। ভোরে জংবাহাদুর এসে ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেয়নি, কেন না যাবার তাড়া নেই। এখান থেকে বেলাকুচি পর্য্যন্ত ছ মাইল রাস্তা বাসেই যাওয়া হবে। একেবারে খাওয়াদাওয়া সেরে দুপুরে রওনা।

গরুড়গঙ্গার পুল পেরিয়ে পাহাড়ী আঁকাবাঁকা পথে চলে এলাম

বেলাকুচি। গরুড়গঙ্গার নুড়ি কুড়িয়ে রাখলে না কি সর্পভয় থাকে না। বিছে কামড়ালে একটা জলেভরা পাত্রে ঘষে নিয়ে লাগালে না কি আরাম হয়। আমাদের নুড়ি কুড়োনো হল না। বাগনানের দিদিমা গজগজ করেন বাস না থামানোর দরুণ।

গাড়ীতে এক আমেরিকান দম্পতীর সঙ্গে আলাপ হল। মাথার ওপর ধাঁ ধাঁ করছে রোদ্দুর। অলকানন্দার তীরে ছোট কয়েকটি চটি। পুল পেরিয়ে ওপারে বাস পাওয়া যাবে, একেবারে যোশীমঠ পর্য্যন্ত নিয়ে যাবে। মোটর যাবার ব্রীজ তৈরী হচ্ছে। এটা শেষ হলে হৃষিকেশ থেকে যোশীমঠ টানা বাসপথে আসা যাবে।

বাস বদল করতে হবে, তাই অপেক্ষা করে আছি। কে জানত কপাল আমাদের মন্দ। খবর এল আজ আর বাস পাওয়া যাবে না। রাস্তার ধারে কয়েকটি ভাঙ্গা বাস চোখে পড়ল। আরও কয়েকটি নাকি পথে বিগড়ে পড়ে আছে। ফলে সেদিন বেলাকুচিতেই রাত্রিবাস।

যাত্রী অনুপাতে বাস সংখ্যা এমনিতেই কম, তার ওপর ব্রেকডাউন। আমাদের আগে যাঁরা এসেছেন, তাঁরাও অপেক্ষা করছেন বাসে সীট পাবার জন্য। হাঙ্গামা পোয়াবার ভয়ে অনেকে হেঁটে রওনা হয়ে গেলেন। আমেরিকান দম্পতী গুডবাই করে চলে গেলেন, কপাল জোরে দুটো সীট ম্যানেজ করেছেন। আর একদল লোক হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সীটের জন্য।

বেলাকুচি জায়গাটা ভাল লাগেনি আমার। ধুলো আর মাছিতে বড্ড অপরিচ্ছন্ন। বাস বদল করে চলে যায় সবাই। কেউই এখানে রাত্রিবাস করে না। তাই দোকানপাটও বেশী নেই।

ছোট ছোট কয়েকটি দোকান রাস্তার ঠিক নীচে। মানুষ চললে ধুলো এসে নাকে লাগে। দোকান সংলগ্ন ছোট ছোট ঘরে চার পাঁচজন ঘেঁষাঘেঁষি করে শুতে পারে। ঝাঁপ নেই, একেবারে খোলা। সামান্য বেড়া দিয়ে তিনদিক ঘেরা, ওপরে খড়ের ছাউনি। সামনে রাস্তা, পেছনে নদী।

দোকানে চা, পকৌড়ী, ঘুগনী, পুরী,পেঁড়া, পাওয়া যায়, তবে খাবারের চেহারা দেখলেই অম্বল হয়। অথচ যাত্রী সমাগমে জিলিপী হয় আড়াই টাকা সের, পুরী হয় চারটাকা সের।

একেবারে রাস্তায় রাত্রিযাপন এই প্রথম। রাস্তায় সুন্দর কয়েকটি কুকুর ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাইতো, এরা যদি রাত্রে মুসাফিরের মুখের কাছে মুখ এনে কিছু বলবার চেষ্টা করে তা হলেই বিপদ। হয়ত মুখে করে কিছু টেনে নিয়েও যেতে পারে আমাদের স্মৃতিচিহ্ন রেখে দেবে বলে।

সারাপথেই দেখেছি পি. ডবলিউ. ডি-র নল বসানো আছে। এখানে কোন নল নেই একটু ওপরে ঝরণা।

সরকার কয়েকটি চটিতে পাকা বিশ্রামগৃহ তৈরী করে দিচ্ছেন। একটি বিশ্রামগৃহ বেলাকুচিতে দেখলাম। রেলওয়ের তৃতীয় শ্রেণী ওয়েটিং রুমের মতো। সিমেণ্টের মেঝেয়, ওপরে টিনের সেড দেওয়া। যাঁরা চটিতে জায়গা পেলেন না, তাঁরা গেলেন সেই বিশ্রামগৃহে।

থাকতেই যখন হবে, তখন জায়গাটা ঘুরে দেখে নিই।

খদ্দরের সার্ট বললেন, আজ তাহলে আমরা বেলুচিস্থানেই রইলাম।

মুক্তোদাদা বললেন, লুচি হয়ত পয়সা দিলে পাওয়া যাবে, সুতরাং বেলুচিস্থান বলি কি করে। এ হচ্ছে বেগাড়ীস্থান। গাড়ী নেই।

থীরু বললে, ঠিক বলেছেন, এহচ্ছে বিগড়ীস্থান। —বলেই মাউথ অর্গানে সুর তোলে 'বিগড়ী হুই দিল'।

বাঙালী, মাদ্রাজী, গুজরাটি, রাজস্থানী, পাঞ্জাবী, হরেক রকম জাত এসে মিশেছে এখানে। এদের আস্তানার পাশ দিয়ে চলি।

কতকগুলি চটির গ্রাউণ্ডফ্লোরটি নদীর তটে। সেখানটা আবার বেড়া দিয়ে ঘেরাও নয়। সেখানেও লোক গিজগিজ করছে।

দুর্গন্ধময় জায়গাটায় কত কষ্টে রয়েছে পুণ্যকামী যাত্রীর দল। একপাশে একটি সাধুকে ঘিরে কয়েকটি স্ত্রীপুরুষ।

একটি চটিতে কয়েকটি বৃদ্ধা আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজনকে দেখি হাত পা নেড়ে লেকচার দিচ্ছেন। বয়স সত্তরের কাছাকাছি। শুনলাম এঁর নাম লালুর মা। ইনিই লীডার। লালুর নামে তার মায়ের পরিচয়, না, লালুর মায়ের নামে তাঁর ছেলের পরিচয় তাই ভাবি। বার কুড়িক এসেছেন উনি ৺কেদার-বদরীর পথে।

সিলিক ঠাকুরমা, জন গিলপিন, রাঙাদি, পিংখাড়ু, সাধুমা আরও অনেকে রয়েছেন সেখানে। পিংখাড়ু ইসারায় ডাকলেন আমাকে। আমিও সেখানে বসে শুনতে লাগলাম লালুর মায়ের কথা।

পিংখাড়ু জানতে চান ৺কেদারে যেমন ফলাহারী বাবা, তেমনি ৺বদরীতে কেউ আছেন কি না। উত্তরে তিনি জানান যে ৺বদরীর পথেই বেশী সাধুসন্ন্যেসী দেখতে পাওয়া যায়। তবে নগর সভ্যতা ক্রমশ তার শাখা বিস্তার করে এসব অঞ্চলে এগিয়ে আসছে বলে সাধুর সংখ্যাও যেন কমে আসছে। চায়ের অর্ডার দিয়ে পিংখাড়ু ফের প্রশ্ন করেন। আবার উনি জবাব দেন।

একবার জানলে বাবা, চোখ কপালে তুলে লালুর মা বলেন, কাপড়টা ঝরণার ধারে রেখে গা ধুতে নেমেছি, ফিরে এসে দেখি সামনেই এক চিতে বাঘ। কি ভয়ই করছিল। এখন তো পথ সুগম হয়ে গেছে।

কথায় কথায় আরো পরিচয় জানতে পারি তাঁর। তিনি এবং সঙ্গের বৃদ্ধারা সবাই এখন বৃন্দাবনবাসী। উনি ওদের লীডার হয়ে এসেছেন, যেমন আসেন প্রতি বারে। গত বিশ বছর ধরে উনি ভারতের বিভিন্ন তীর্থে এইভাবে বিশেষ করে বৃদ্ধা, বিধবাদের দর্শন করিয়ে আনেন সামান্য পারিশ্রমিকে। রাসে রাসবিহারী,

দোলে দোলগোবিন্দ কিছুই বাকী নেই তাঁর। বেশ ভাল লাগছে তাঁকে।

আমাকে খাতায় নোট নিতে দেখে বললেন, কতটুকুই আর গল্প করলুম বাবা। তবে লিখে রাখতে চাও যদি, একবার বৃন্দাবনে এসো। গল্প বলবো।

বলেই কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে যান তিনি। হয় তো কোন পারিবারিক ঘটনার কথার স্মৃতিবিজড়িত চিন্তা তাঁকে অন্যমনস্ক করল।

বিষণ্ণ হয়ে বললেন, উনি যখন মারা যান, কিছুই ছিল না হাতে। ছিল কেবল তু সের সোনা। তখনকার দিনের তু সের। সেইটা বেচে ছেলেদের লেখাপড়া শিখিয়েছি। ভগবানের কৃপায় বড় ছেলেটি জানলে বাবা, ম্যাট্রিক পাশ করে সংস্কৃত পাশ করেছে। এখন পুরুতগিরি করে। ছোটটি এম.এস্.সি পাশ করে বোম্বেতে চাকরি করে। আর একটি মাত্র মেয়ের আই এ পাশ করার পরই বিয়ে দিয়ে দিয়েছি।

অবাক হলাম তাঁর কথায়। এমন মানুষ কেন বৃন্দাবনবাসী, কেনই বা যাত্রী সংগ্রহ করে দিন গুজরাণ করেন জানতে গিয়েও জানতে পারলাম না। লেখকসত্ত্বা সে ট্র্যাজেডীর ছবিটা কল্পনায় প্রত্যক্ষ করে যেন।

চটিওলা অনেক খদ্দের পেয়ে যায়। কাঠের আগুণ দ্বিগুণ হয়ে জ্বলে খোঁচা খেয়ে। ধোঁয়ায় ঘরটা ভরে যায়। এই এক জ্বালা। তু দণ্ড নিশ্চিন্তে বসবার যো নেই। দোকানীর স্ত্রী সাহায্য করে দোকানীকে। তুধটা এগিয়ে দেয়, গ্লাসটা ধুয়ে দেয়।

বাচ্চা ফুটফুটে ছেলেটি চা এগিয়ে দিতে গিয়ে চায়ের গেলাস থেকে একটু চলকে পড়ে যায়।

জন গিলপিন তার হাত থেকে গেলাসটা নিয়ে তাকে রেহাই

দিলেন, কিন্তু গরম চা শুদ্ধু গেলাসটা ধরে রাখতে পারেন না। অনেকটা চা পড়ে গেল।

পিংখাড়ু বললেন, কি দাদা কেমন লাগছে।

নিজের কথা অপরের মুখে শুনে জন গিলপিন তো রেগে টং। ওদিকে একজন খদ্দের হিসেব নিয়ে গোলমাল সুরু করে দেয়।

কুম্ভমেলার গল্প সুরু করেন লালুর মা।

পিংখাড়ু সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করেন, আচ্ছা বলুন তো কত লোক মারা যায় কুম্ভে।

অনেক অনেক। দেখ বাপু, জুতো দেখে লোক গণনা করা যায় না। বে' বাড়ীতে আগুণ লাগলে জুতো ফেলে পালাবে সবাই। তা বলে কি জুতো গুণে বলা যায় ক'জন লোক মরল। কে হিসেব রাখে।

রাঙাদির এক কথার উত্তরে বললেন, দেশঘর জমিজমা ছিল পূর্ব্ববঙ্গে। তবে স্বামী মারা যাবার পরই ভিটে ছাড়তে হয়েছিলো। সে কি আজকের কথা। তখন পার্টিশন হয়নি।

একটু থেমে বললেন, পার্টিশন হয়েছিলো। দেশ নয়, আমার জমিজমা, ঘরদোর।

লালুর মায়ের গল্প শুনতে আরও লোক জড় হয়েছেন। বিস্মিত হয়ে শুনছি সবাই। এই বৃদ্ধারা দিনে প্রায় ১৫।১৬ মাইল হাঁটেন। দিনে গাছতলাতে বিশ্রাম নেন।

বলেন, গাছতলায় যার নিবাস তার চুরির ভয় নেই। রাস্তায় বেরুলে পথই পাহারাদার।

রসগোল্লাদা বলেন, আপনি কলকাতায় অফিস খুলুন।

হাসতে হাসতে উনি বলেন, তুমি যা ভাবছ তা হবে না। তোমাকে ম্যানেজার করে দিই আর কি!

ওঁরা জিনিষপত্র বাঁধাছাদা করতে সুরু করেন। বাসের জন্য অপেক্ষা না করে হেঁটেই এগিয়ে যাবেন।

আমাদের চটির ঠিক সামনেই পি, ডবলিউ, ডি. ডিপার্টমেণ্টের অফিসঘর। তার নিশানা হিসেবে জোর পাওয়ারের বাল্ব। ওরই আলোয় কাজ চলে যায় আমাদের। বটকেষ্ট হ্যারিকেন দিতে এসে ফেরৎ নিয়ে গেল। একটা মিশ্র ঐক্যতান ছোট জায়গাটা ভরিয়ে রেখেছে। জেনারেটরের ফটফট আওয়াজ, অলকানন্দার ছলছল শব্দ, পাশে চটিওলার কড়াইতে ছ্যাঁকছোঁক শব্দ আর অদূরে কন্‌স্‌ট্রাক্‌সন্‌ কুলীদের দুর্ব্বোধ্য গাড়োয়ালী ভাষার কোরাস।

গুজরাটিদের সেই মেয়েটি ভাব জমিয়েছে এম. পি-র সঙ্গে। দুজনেরই হাতে গরম জিলিপী। থীরু ওদের দেখিয়ে দেখিয়ে পকৌড়ী খেতে সুরু করে। যোগ দিই আমি আর অপর তিন পাণ্ডব।

'ম' বাবু আসেন খোঁজখবর নিতে। একদিন থাকতে হল বলে দুঃখপ্রকাশ করে জানালেন বাসের টিকিট হয়ে গেছে। খবরটা সকলকে দিতে বেরিয়েছেন তিনি।

আমাদের মস্ত চিন্তা কি করে ঘুমোবো। খোলা জায়গায় প্রচণ্ড শীতে কাঁপতে থাকার ভাবনা যত, ততই ভাবনা জিনিষপত্র খোয়া যাবার। ঠিক হল, পালা করে রাত জাগতে হবে সকলকে। খাবার পালা চুকতেই গা এলিয়ে দিই সবাই।

রাত অবশ্য কাউকেই জাগতে হয়নি। জিনিষপত্রও কিছু খোয়া যায়নি। রাত্তিরটা যে কোথা দিয়ে কেটে গেল টেরই পাওয়া গেল না। ভয় থাকলে মানুষ নিশ্চিন্ত হতে পারে না, আমরা শেষপর্য্যন্ত নির্ভীক হয়েছিলাম।

পরদিন সকালে হেঁটে পুল পার হই। বাস তৈরী ছিল। এম. পি-র সঙ্গে গুজরাটি মেয়েটির খুব বন্ধুত্ব হয়েছে। ওর নাম কমলি। কমলিরা বাসে সীট পায়নি। এম. পি-কে বাসে তুলে দিতে এসেছে সে।

এম. পি. হেসে বললে, ফির মিলেঙ্গী।

সে জবাব দিল— জরুর।

দু পাশের অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য—নয়নমুগ্ধকর শোভা দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছি। পাইনের বন, ঝাউয়ের বন পেরিয়ে বাস চলেছে। বাস থেকে সব গাছ চেনা যায় না। বনবিছুটি, রক্তকরবী, চামেলির ঝোপঝাড়ের গা দিয়ে গেছে পথ।

সাবেকী হাঁটাপথ ছেড়ে অনেকে বাসপথে হাঁটা স্বুরু করেন। গোলাবকুঠি কুমারচটির চড়াই পথে অনেকে যেতে চান না। বাসপথ প্রশস্ত এবং তাতে হোঁচট খাবার ভয় কম। চড়াই হলেও তেমন কষ্টকর নয়।

পথের পাশে একটি মুমূর্ষু মহিলাকে দেখে বাস থামিয়ে দেয় ড্রাইভার। কণ্ডাক্টর নেমে গিয়ে তাকে পরীক্ষা করে। ফিরে এসে জানায় তার শ্বাস বইছে এখনো। মরেনি তা হলে। মহিলাটির সঙ্গে কোন লোক নেই, নিশ্চয়ই এগিয়ে গেছে তারা। আশ্চর্য্য, এমন অবস্থায় ফেলে রেখে পালানোর কোন মানে হয়! তবু ফেলেই রেখে যায় স্বার্থপর মানুষ।

মহিলাটি বাসে চাপতে নারাজ।

আবার চলল বাস। কণ্ডাক্টরকে প্রশ্ন করে জানতে পারি, এমন কোন যাত্রী দেখলে ওদের কর্ত্তব্যের কথা। নিকটবর্তী কোন হাসপাতালে ওরা যেমন করে হোক পৌঁছিয়ে দেয় মৃতকল্পকে। মনে মনে এ কাজের প্রশংসা না করে পারি না। এ অবস্থায় মহিলাটি কেন বাসে চেপে যেতে রাজী হলেন না, বুঝতে পারি না।

উঁচুনীচু পথে বাস চলেছে আর গুড়ের নাগরীর মতো দুলছি আমরা। হেয়ারপিন, ঘোঁড়ার খুর যেমন আকৃতি, তেমনি ধারা বাঁক পেরিয়ে ফুলস্পীডে বাস চালাচ্ছে ড্রাইভার একেবারে নির্লিপ্ত হয়ে। হ্যারিকেনের তেল ছিটকে পড়ে এম. পি-র শাড়ীতে, হ্যাণ্ডব্যাগ ঠকাস্ করে গিয়ে ঠেকে পায়ের ওপর। নীচু হয়ে আঘাতপ্রাপ্ত জায়গাটায় হাত বুলোতে গিয়ে মাথা ঠুকে যায় আর একজনের সঙ্গে।

এমন অবস্থায় হঠাৎ বাসটা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। ওদিক থেকে আসছে মালবাহী খচ্চর বাহিনী। বাসের ইঞ্জিনের শব্দ বা হর্ণের শব্দে ভয় পায় ওরা। পাছে লাফিয়ে উঠে একটা বিদিকিচ্ছিরি অবস্থার সৃষ্টি করে, তাই তাদের সাবধানে আগলাতে আগলাতে পার করে নিয়ে যায় সহিসেরা। বাসও ইঞ্জিন বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

গুরুজী বললে, নিতান্ত গ্রাম্য খচ্চর। মানুষ হয়নি এখনও।

মুক্তোদাদা বললেন, আর মানুষ হয়ে কাজ নেই।

অনেক যাত্রী হাত বাড়িয়ে বাস থামাতে যান। বাস দাঁড়ায় না। আমরা রিসার্ভ করেছি সব সীট। অনেক নীচে অলকানন্দার গর্জ্জন তত শোনা যায় না। জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে গিয়ে মাথা ঘুরে ওঠে।

একটা পাহাড় থেকে আর একটা পাহাড়ে উঠি। দুটো পাহাড় মিশেছে যেখানটায়, সে জায়গাটা বড়ই রমণীয়। নীচে ক্ষেত, আর ওপরে আকাশ, মাঝখানে আমাদের বুকে নিয়ে প্রকাণ্ড এক ভূখণ্ড। আপেলের গাছ থেকে পাকা আপেল ঝুলছে রাস্তার ওপর। সরকারের রিসার্ভ ফরেষ্টের জিনিষ, নইলে পেড়ে নেওয়া যেত।

বেলাকুচি থেকে পনের মাইল পথ অতিক্রম করে পৌঁছে গেলাম যোশীমঠ। ৺কেদার তীর্থপথে যেমন উখীমঠ, ৺বদরীর পথে তেমনি যোশীমঠ, ৺বদরীনাথের শীতকালীন উপাসনাস্থান।

বাসষ্ট্যাণ্ডের গায়েই থানা। আমেরিকান দম্পতীকে সেখানে দেখে বুঝতে পারি কিছু গোলমাল হয়েছে। ওরা তো আমাদের আগেই এসেছেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেল ছাড়পত্র নিয়ে গোলমাল হয়েছে। দিল্লীতে খবর গেছে, উত্তরের অপেক্ষা করতেই হবে। বিদেশীদের এ দুর্ভোগ দেখে তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন অনেকে। কিন্তু পুলিশ যখন ভার নিয়েছে, তখন আমাদের আর কি-ই বা করবার আছে।

বেশ বড় জায়গা যোশীমঠ। সমুদ্রতল থেকে ছ হাজারেরও কিছু বেশী ফিট উঁচু।

একটা লাইব্রেরী চোখে পড়ল আর অমনি ছুটে চলি খবরের কাগজের লোভে। আমার হাতে খবরের কাগজ দেখে এগিয়ে আসেন খবরের প্রত্যাশায় কেউ কেউ। তাঁদের প্রশ্নের উত্তরে গম্ভীরভাবে বলি, খবরের মধ্যে বড় খবর হচ্ছে এখান থেকে ৺বদরীনাথ উনিশ মাইল। সবটাই হাঁটা পথ। দ্বিতীয় খবর হচ্ছে, রাস্তা ভাল নয়। তৃতীয় খবর হচ্ছে—

আমাকে থামিয়ে দিয়ে খদ্দরের সার্ট বললেন, থামুন মশাই। ও খবর চাইনা আমরা।

এবাউট্ টার্ণ করে চলে গেলেন তিনি মুখখানা হাঁড়িপানা করে। ওঁর পেছনে চললেন আর সবাই যাঁরা খবরের লোভে এসেছিলেন।

গুরুজী বললে, এটা কি হল ?

বললাম, খবরদারী। কাগজটা যে পুরোণো।

অনেকগুলি দোকান। বেশ সাজানো সব কটি আর খদ্দেরও খুব। মাদ্রাজী পাইস হোটেলও একটি রয়েছে। হোটেলের পাশে একটা চটিতে আস্তানা গাড়া হল।

বেশ একটা বড় চত্বরের চারপাশে নৃশিংহ বদরী, নবদূর্গা, বাসুদেব প্রভৃতি দেবদেবীর মন্দির। একপাশে একটি কুণ্ড। কুণ্ডে স্নানের জন্য হুটোপুটি পড়ে যায়। পাণ্ডা সবাইকে সঙ্কল্প করবার জন্যে অনুরোধ করে। কুণ্ডে দুটি জলের ধারা, প্রয়োজনে একটি মেয়েদের জন্য, অপরটি ছেলেদের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে।

স্নান সেরে মন্দির দর্শন করি। তারপর চাতালে কাপড় মেলে দিই। যাত্রীর ভিড়ে জমজমাট জায়গাটা। একটি সাধু একমনে গাঁজা সেবন করছে। পাশে একজন মোটাসোটা মেয়েমানুষ। সেবাদাসী বোধ হয়। এদের জুটেও যায়!

পরিস্কার বাংলা ভাষায় তিনি আমাদের বললেন, বাঙালী বোধ হচ্ছে। বিড়ি খাবার দুটো পয়সা দেবে বাবা।

বলা বাহুল্য, লোকটার চালচলনে হাবভাবে বিতৃষ্ণ হয়ে পয়সা দিতে প্রবৃত্তি হয় না। পঞ্চপাণ্ডব অপাত্রে দান করে না।

রান্নার দেরী আছে দেখে প্রস্তাব হল জ্যোতির্মঠ দেখতে যাওয়ার। ভগবান শঙ্করাচার্য্যের নিজের হাতে স্থাপিত চারটি মঠের মধ্যে এইটি অন্যতম। যোশীমঠ থেকে খানিকটা দূরে পাহাড়ের চূড়োয় এই মঠটি।

গমের ক্ষেতের ভেতর দিয়ে, পি, ডবলিউ, ডি বাংলোর পাশ দিয়ে আঁকাবাকা পথ ওপরে উঠে গেছে। সেই পথ ধরে চলি। বাতাসে আন্দোলিত গমের শীর্ষ হতে সরসর করে ভারী মিষ্টি আওয়াজ হচ্ছে।

মঠের পাদদেশে জ্যোতির্লিঙ্গ মহাদেবের মন্দির। প্রাচীর গাত্রে সংস্কৃত পুণ্যশ্লোক খোদিত।

ছায়ায় ঘেরা গোলাপের সুবাসভরা জায়গাটা এমনই নির্জন যে স্বভাবতই মনটা উদাস হয়ে যায়। ন্যাসপাতি গাছ যত, তত আখরোটের গাছ। ইচ্ছে হয় হাত বাড়িয়ে পেড়ে নিই। পরক্ষণেই এ আশ্রমের পবিত্রতা নষ্ট হবার ভয়ে বিরত হই। মনের দোটানা চলে অবিরত।

দোতলা এক কুঠির ওপরে সীতারাম সাধুর বাস! ঘরের মধ্যে একপাশে কৌপীন পরিহিত বৃদ্ধকে প্রণাম জানাই একে একে আমি, থীরু ও আর সবাই। ইনিই সীতারাম বাবা। শুনেছি শতবর্ষের বেশী এঁর বয়স। আমরা কলকাতা থেকে আসছি শুনে খুশী হলেন। আশীর্ব্বাদ করলেন আমাদের। ফিরে এসে শঙ্করাচার্য্যের উত্তরধামের গল্প করি আর সবাইকে, যাঁরা যেতে চাননি বা যেতে পারেননি।

পাণ্ডারা লোভ দেখায় কৈলাস, মানস সরোবর যাবার জন্যে। যোশীমঠ থেকে ভবিষ্যবদরী যাবার পথ আছে, পথ আছে 'নিতি' পাশ পেরিয়ে মানস সরোবর যাবার। যাবার লোভ কার না হয় কিন্তু

সময় এবং অর্থসঙ্গতির সুবিধে হলেই তা সম্ভব। এসব জায়গা বারমাসই ঠাণ্ডা। মে মাসেই এই অবস্থা, না জানি নভেম্বর ডিসেম্বরে কেমন করে লোকে থাকে এখানে।

খাওয়ার পাট চুকলেই আবার বেরিয়ে পড়বার উদ্যোগ হয়। গুরুজীর 'চল বেটা' ডাকে ঝিমিয়ে পড়া মানুষ লাফিয়ে ওঠে। থীরুর মাউথ অর্গানে সুর ওঠে 'পথ আর কত দূর'।

দিদিমণি বলেন, তানসেন ভাই, মালাইচাকীর গানটা আবার একবার হোক।

অনুরোধ রাখতে হল। আর এক দফা হাসির হুল্লোড়।

আবার সুরু হল হাঁটা পথ। রাস্তা ভাল নয় শুনে আবার নতুন করে ঘোড়া খোঁজেন কেউ কেউ। বাগনানের দিদিমার নাতির জ্বর হয়েছে। বেহুঁস হয়ে এতক্ষণ শুয়েছিলেন। একটু ষ্টেডী হতে ঘোড়ায় চেপে বসেন। ঘোড়াওলাকে সজাগ থাকতে বলি আমরা। সাধুমা কাণ্ডী করলেন।

খানিকটা সোজা উৎরাই। আর মাত্র উনিশ মাইল পথ পেরুতে পারলেই পৌঁছে যাব ৺বদরীনাথে।

কতদিনের আশা, কতদিনের স্বপ্ন বাস্তব রূপ নিতে চলেছে। মনের মধ্যে তোলপাড় করে হাজার চিন্তা। সমস্ত শঙ্কা, সমস্ত ভয়ের মেঘ কেটে গিয়ে ভবিষ্যআনন্দের পূর্ণচন্দ্র উদ্ভাসিত করে মনকে। আসে উৎসাহের বন্যা, আসে উদ্দীপনার জোয়ার। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত দেহেও শক্তি জেগে ওঠে ক্লান্তির নিদ্রা ভেঙ্গে। তীর্থের পথে পথই তো গাইড, পথই বন্ধু। পথের সঙ্গেই মিতালী পাতাতে হবে।

তুঙ্গনাথের উৎরাই যেমন, যোশীমঠ থেকে বিষ্ণুপ্রয়াগ প্রায় তেমনি। অতল গহ্বরে নেমে চলেছি যেন। হাঁটুর মালাইচাকীতে ব্যথা ধরে যায়। ঘোড়ামার্কা বিড়ি মুখে দিয়ে জন গিলপিন ঘোড়ায় চেপে চলেছেন। ওঁর স্ত্রী হাঁটছেন ঘোড়ার মালিশ পায়ে লাগাবার কথা চিন্তা করতে করতে। ওঁদের স্বামী-স্ত্রীর আলাপ কানে এল।

জন গিলপিন বলেন, তোমার জন্যে আমায় লোকের কাছে কথা শুনতে হচ্ছে। বেশ তো ডাণ্ডী চেপে আসছিলে, আবার হেঁটে যাবার সখ কেন।

উত্তর দেন ওঁর স্ত্রী, তোমার পাল্লায় পড়েই আমাকে অন্যায় করতে হচ্ছে। তুমি মানো বা না মানো, আমি বিশ্বাস করি হেঁটে গেলে পুণ্যি বেশী। আমি হেঁটেই যাব এখন থেকে।

তারপর আমাদের দেখিয়ে বলেন, এই তো এনারা হেঁটে যাচ্ছেন। আমিও পারব।

ওরা জোয়ান ছেলে—জন গিলপিন যুক্তি দিলেন।

তা হোক। না পারলে বাহন তো আছেই।

তৃপ্ত হলাম ওঁর বিশ্বাস আর মনোবল দেখে। পথের মুমূর্ষু মহিলাটি কেন বাসে চেপে যেতে রাজী হননি, এইবার বুঝতে পারি। চিৎকার করে বলে উঠি, জয় বাবা ৺বদরী বিশাল কি জয়।

সমস্বরে সবাই বলেন, ৺বদরী বিশাল কি জয়।

যোশীমঠ থেকে দু মাইল নীচে বিষ্ণুপ্রয়াগ। অলকানন্দা ও ধবলীর সঙ্গম। এ পথের পঞ্চপ্রয়াগের তৃতীয় প্রয়াগ পেলাম। কথিত আছে, এই স্থানে নারদ বিষ্ণুর আরাধনা করেছিলেন এবং সর্বজ্ঞত্বলাভ করেছিলেন।

ফটো নেওয়া হল অনেকগুলি। প্রচণ্ড জলকল্লোল শুনতে শুনতে পুল পেরিয়ে এপারে আসি। যে পথ অতিক্রান্ত হল, পেছন ফিরে একবার তাকিয়ে দেখি সেদিক পানে। একটা পাকদণ্ডী পথ আছে, কুলীরা সেই পথে নেমে এল।

বিষ্ণুপ্রয়াগ রইল পড়ে।

বলদোয়েড়া চটিতে জলখাবার খাবার জন্যে দাঁড়াই। খাবার পাই না, জল পাই, জল খাই। গাইডবুক পড়ে যে পথ সঙ্কীর্ণ বলে জেনে এসেছি, তার চেহারা এবার প্রত্যক্ষ দেখি।

এক জায়গায় পথের ওপর যেন ছাতা ধরে আছে আর একটা

বড় পাথরের চাঁই। যদি এখনই ভেঙ্গে পড়ে, তাহলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব! সে জায়গাটা বেশ ঠাণ্ডা। পথ ডুবে গেছে ঝরণার জলে কোথাও বা। জলের ওপর দিয়েই চলতে হয় আমাদের।

দুপাশে 'জয় বিজয়' পাহাড় দেখে থীরু তোলে ছবি আর মুক্তোদাদার 'লাভলি' ডাক শুনে বুঝতে পারি তার আনন্দের পরিমাণ।

রাস্তা এবারে খুব চড়াই নয়, খুব উৎরাই নয়। খানিকটা পথ বেশ সমতল। নীচে নদীর কুলুকুলু ধ্বনি আর দুপাশে পাহাড়। ওদিকে গাছের ডালে মুখপোড়া বাঁদরের মুখ ভ্যাংচানি। কত জায়গায় যে এলোমেলো নুড়ি ছড়ানো পথের ওপর, তা বলবার নয়।

মধ্যম পাণ্ডব এক একবার পকেটে হাত ঢোকাচ্ছে আর খুচরো যা উঠছে তা বিলিয়ে দিচ্ছে ফুটফুটে ছেলেমেয়েদের মধ্যে। একটা ছোট ছেলে চট্টি চ্যাটার্জীর লাঠিটা চেপে ধরে রইল। আহা, বড্ড করুণ চাউনী। চট্টি চ্যাটার্জী একটা দশ নয়া পয়সার টুকরো তার দিকে ছুড়ে দিতে তবে ছাড়া পেল। হাসির আলোয় স্নাত পরিতৃপ্তির পূর্ণ প্রকাশ ছেলেটির চোখে মুখে।

পাঞ্জাবী ও দক্ষিণ ভারতীয় যাত্রী এবারে অনেক। যাঁদের 'ম' বাবু নেই, তাঁরাও বেশ আমোদ করে যাচ্ছেন। কোথাও গাছের ছায়া পেলে দলশুদ্ধ বসে যাচ্ছেন, কিছু গালগল্প চলে, তারপর আবার তল্পিতল্পা নিয়ে উঠে পড়েন। চটিতে লেপ ভাড়া নেন, নিজেরা রুটি বানিয়ে খান এবং ভজন গান করেন।

ঘাট চটি পার হয়ে প্রায় এক মাইল চলে এসেছি। ডান দিকে একটা পথ বেঁকে গেছে। ঠিক মোড়ের মাথায় মস্তবড় সাইন বোর্ড। তাতে লেখা, এই পথেই নন্দন কানন (ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স) যাওয়া যায়।

জানা গেল উনিশশ' একত্রিশ সালে এফ, এস, স্মিথ নামে জনৈক ইউরোপীয় এক অভিযানে নেতা হয়ে এই উপত্যকা আবিষ্কার করেন।

উনিশশ' সাঁইত্রিশ সালে আবার তিনি এখানে এসেছিলেন এবং প্রায় আড়াইশ' রকমের বিভিন্ন ফুল সংগ্রহ করেছিলেন। যোশীমঠ থেকে খাবার ও তাঁবু নিয়ে তবে আসতে হয়। যেমন দুর্গম, তেমনি মনোরমও বটে এই পথ। বেশী দূর নয়, প্রায় বার মাইল পাহাড়ী জংলা রাস্তা পেরুতে হয়।

পথে পড়ে হেমকুণ্ড লোকপাল। শুনলাম, শিখ ধর্মগুরু গুরুগোবিন্দ সিং এখানে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। একটি গুরুদ্বারও আছে। আর আছে সাতটি পর্ব্বতচূড়োয় বেষ্টিত একটি মনোরম হ্রদ।

এক যাত্রায় সব দেখা সম্ভব নয়। যদি কোনদিন গঙ্গোত্রী আসবার সুযোগ ঘটে, সেবারে নন্দনকানন দেখে আসব এরকম ইচ্ছে প্রকাশ করতেই থীরু, গুরুজী এরা সব সঙ্গী হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিল। দুপাশে পাহাড়, মাঝখানে পথ। আমরা এগিয়ে চলি টুক টুক করে।

আজকের রাত্রিবাস পাণ্ডুকেশ্বরে। খানিকটা যেতেই দেখা গেল পাণ্ডুকেশ্বরের মন্দিরের চূড়ো। যদিও আজ বেশী হাঁটা হয়নি, তবু পরিশ্রান্ত হয়েছি খুবই। রাস্তার পাথরে হোঁচট খেয়েছি বেশ বারকয়েক।

সিলিক ঠাকুরমার ডাণ্ডী গেল পাশ দিয়ে।

বললেন, অ ছেলে, পায়ে বুঝি খুব ব্যথা।

জবাব দিই, না, তেমন কিছু নয়।

আমি জানি, রসগোল্লাদা কোমরের ব্যথায় যে রকম কষ্ট পাচ্ছেন, তার তুলনায় কিছুই নয়।

প্রায় সাড়ে ছ-হাজার ফিট উঁচুতে উঠে এসেছি। বেশ কনকনে ঠাণ্ডা। দলের সবাই এসে পড়ল কি না খোঁজ নিচ্ছেন কেউ কেউ। কোথাকার সব লোক, কদিনের জন্য একত্র হইছি, তবু দলের প্রতি কেমন যেন মায়া সকলের।

হাঁটার ব্যাপারে থীরুই ফার্ষ্ট। পৌঁছে গেছে সকলেব আগে।

বিশ্রামান্তে বেরিয়ে পড়ি মন্দিরপানে। ঘন অন্ধকারে টর্চ জ্বেলে আগে গুরুজী, পেছনে অন্য সবাই। রাজস্থানীদের দলটি দর্শন সেরে কলরব করতে করতে ফিরল।

সিঁড়ি ভেঙ্গে নামতে হয় খানিকটা। পূজারী ছিলেন সেখানে। মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে গেছল, আবার খুলে দিলেন আমাদের দেখে।

দুটি মন্দির পাশাপাশি। পাণ্ডবেরা পিতার নামে এখানে বাসুদেবের মন্দির স্থাপনা করেন। একটি মন্দির বাসুদেবের, আর অপরটি যোগবদরীর। মন্দিরের সামনে ছোট চত্বরে আরও কয়েকটি শিলা। শিলা নয়, সবকটিই সিন্দুরচন্দনচর্চ্চিত কোন না কোন বিগ্রহ। শুনলাম, মন্দিরে তাম্রশাসন পাত্র ছিল, বর্তমানে তা ৺বদরীনাথের মন্দিরে রক্ষিত।

পূজারী আগ্রহ করে সমস্ত দেখালেন আমাদের। তার পরেই ভেট দেওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি। যতটা আশা করেছিলেন, ততটা দক্ষিণা পেলেন না, তাই তার কণ্ঠে উষ্মা প্রকাশ পেল।

ফিরে আসবার সময় কে একজন বললেন, পাণ্ডাঠাকুরের মত এ রকম চোখ আমি দেখিনি। লোকটি নিশ্চয়ই সাধক।

আমিও দেখেছি তার রক্তবর্ণ চোখ। বললাম, ঠিক বলেছেন। আমিও ঢের ঢের পূজারী দেখেছি, এমন গাঁজাখাওয়া চোখ আমি দেখেনি কারও।

মূহুর্ত্তে প্রলয় ঘটে গেল। যাঁকে উদ্দেশ্য করে কথাটা বলি, রাগে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে তিনি বললেন, যত সব অমঙ্গলে কথা। ছিঃ ছিঃ—বলে উদভ্রান্তের মতো চলে গেলেন।

তাঁর ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করেছি, অপ্রসন্ন তিনি তো হবেনই। কথায় বলে, সত্যম অপ্রিয়ম মা বদ। কিন্তু আলোচনার আসরে অসত্য যদি সত্যের প্রাধান্য পায়, তখন প্রতিবাদ না করে পারি না।

নাস্তিক নই, তবে ভড়ং বা বুজরুকীতেও মন সায় দেয় না। যে ভাবে যাত্রীদের কাছ থেকে 'ভেট' চাওয়া হয়, তাতে মন আর বিরূপ

হবে না-ই বা কেন ? রক্তের মধ্যে যে ধারা প্রবহমান, পারিপার্শ্বিক কর্মের যজ্ঞে তা হয় শুদ্ধ। কর্মে যেখানে ফাঁকি, নিষ্ঠার নামে যেখানে স্বার্থের বেসাতি, সেখানে অকল্যাণ বৈ কল্যাণের পথ কোথায়।

মন্দির থেকে বেরিয়ে আসি। দোকানপাট বেশী নেই। একই পথে ঘোরাঘুরি করে আবার চটিতে ফিরে আসব, এমন সময় গুজরাটিদের মেয়ে কমলি এসে এম. পি'র কথা জিজ্ঞাসা করায় গুরুজী হেসে বললে, এম. পি. তো আসেনি। সে যোশীমঠে রয়ে গেছে।

ঝুট।

চকিতে ধরে ফেলে সে গুরুজীর চালাকী। কমলি ছাড়বার পাত্রী নয়। অতএব তাকে সঙ্গে করে এম. পি'র কাছে নিয়ে যায় থীরু।

এক জায়গায় কে একজন অন্য যাত্রীদের বলছিলেন পথের অসুবিধের কথা। বোঝাচ্ছিলেন, এ পথে কেবলই কষ্ট। কোথায় লোককে উৎসাহ দেবেন, না, নিরুৎসাহ করছিলেন।

থীরু সহ্য করতে না পেরে বললে, জি. বি. এম. বি—জ্ঞান বিজ্ঞানের মধু ভাণ্ড। এ জ্ঞান কি লোককে না দিলেই নয়।

চট্টি চ্যাটার্জী যোগ করে দিলে, ব্র্যাকেটে জি-ইউ। গাড়োয়াল ইউনিভার্সিটি।

হেসে উঠি সবাই ওর কথায়। জি. বি. এম. বি গম্ভীর হয়ে যান।

সকালে যথারীতি রওনা হওয়া গেল। ৺বদরীনাথের যত কাছে আসছি, ততই মনটা আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠছে। মাইলপোষ্টে লেখা দূরত্বের মান যত কমছে, ততই বাড়ছে খুশীর পরিমাণ। অনেক যাত্রী; সবাই চলেছে সেই তীর্থে, যেখানে রয়েছেন ৺বদরীবিশাল। যাঁদের দর্শন শেষ হল তাঁরা ফিরছেন উৎফুল্ল হয়ে, আমরা চলেছি গন্তব্যকে কাছে পাওয়ার আনন্দে।

একটু একটু করে চড়াই বাড়ছে। গঙ্গাকে পার হতে হয়েছে বেশ

কয়েকবার। বরফ জমে রয়েছে কোথাও কোথাও। কোথাও বরফের মাঝখানটা চাপে ধ্বসে গিয়ে বিরাট এক গহ্বর সৃষ্টি হয়েছে আর সেই গহ্বরের মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে নীচে স্রোতধারা। ইচ্ছে হচ্ছে, বরফের ঢাকনাটা কেউ তুলে নিক নদীর ওপর থেকে। ধ্যেৎ, তাও কি হয়। কোথাও একটানা স্রোতের গর্জ্জন মনকে ভুলিয়ে রাখে।

ওপরে পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে শ্বেতবর্ণ প্রলেপ। রোদ পড়ে চিক চিক করছে পাহাড়ের ওপরের ওই তুষারশুভ্র অঞ্চল।

সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিতে কোথাও অসামঞ্জস্য নেই। ঠিক যেখানে যেমনটি, সেখানে তেমনটি।

লামবগড় চটি পার হয়ে এগিয়ে চলি। আগে যেমন বর্ণনা দিয়েছি, তেমন একটা বিশ্রামগৃহ এখানে তৈরী হচ্ছে। আরও এগিয়ে এসে হনুমানচটিতে দুপুরে বিশ্রাম।

ঝরণার ধারেই চটি। বড় বড় পাথরের চাঁইয়ের গা বেয়ে ঝরণা। ওপেন এয়ার বাথ সেরে নিলেন অনেকে।

দক্ষিণ ভারতীয়দের একটি দল চটিতে উঠলেন না। পথেই দেখেছি ওঁদের, কিন্তু ওঁরা যে চটিতে ওঠেন না, তাতো লক্ষ্য করিনি। ঝরণার দিকে যেখানে জলের বেগ কম, সেইখানটায় পাথরের ওপর হাঁড়ি কড়া পেতে সংসার সাজিয়ে বসলে ওঁরা। খোঁজ নিয়ে জানি, ওঁরা ব্রাহ্মণ। জাত বাঁচাচ্ছেন এমনি করে নানা জাতের ভিড়ে অশুচি চটিতে না উঠে।

হাসি পায়। চলেছে নারায়ণ দর্শনে, অথচ মানুষের নারায়ণকে এমনি করে দূরে ফেলে দিতে সঙ্কোচ নেই, দ্বিধা নেই। 'নারায়ণের জাত যদি নেই, তোদের কেন জাতের বালাই'। তা নয় হোল, রাত্রে করে কি এরা! কে জানে? জাত বাঁচাতে ঠাণ্ডাতেই শোয় বোধ হয়।

বাঙ্গালীদের একটি ছোট দলের সঙ্গে আলাপ হল। বরাবর নিজেরা হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাচ্ছেন। এখানে এবেলা একটি পাঞ্জাবী

মহিলাকে সরাসরি 'মা' বলে ডেকে ফোস্কাপড়া হাত দেখিয়ে, তাঁদের সঙ্গেই রান্নার বন্দোবস্ত করেছেন। চাল ডাল অবশ্য কিনে দিয়েছেন। গণ্ডগোল তো উনুন নিয়ে। কাঠের আগুন ধরতেই চায় না। তারপর ধোঁয়ায় চোখ যায় জ্বলে। তু-মুঠো স্বপাক করতে কি বিভ্রাট।

খদ্দরের সার্ট আর ঠাকুরপো চললেন চটি ছেড়ে একটু দূরে। একজন চিঠি লিখতে, আর একজন চিঠি পড়তে। ঠাকুরপোর একটা ভারী চিঠি এসেছে কাল।

শান্তিদিদি বললেন, ঠাকুরপো যেন বানান করে পড়তে যেও না। তাহলে পিছিয়ে পড়বে।

বৌরাণী চললেন হনুমানজীর মন্দির দেখতে। সঙ্গে চললেন বি. বি. সি, রাঙাদি, বাগনানের দিদিমা, এলাহাবাদের পিসিমা, বঙ্কুদা।

শীত করছে খুবই। তাই আমি আর স্নান করি না। জংবাহাতুর বিড়ি খাবার পয়সা নিয়ে গেল। ডায়েরীর কয়েকটি পাতামাত্র লেখা হয়েছে, খাবার ডাক এল। খাওয়া দাওয়ার পর আজ আর কেউ গা এলিয়ে দিতে চাইলেন না।

মুক্তোদাদা বললেন, আর নয়। বিকেলে ওখানে পৌঁছে একেবারে তুদিনের জন্য বিশ্রাম।

'ম' বাবু এতবড় একটা দলের ঝক্কি নিয়ে শেষ পর্য্যন্ত সবাইকে খুশী করবার জন্য ছুটোছুটি করছেন এ চটি সে চটি। মুক্তোদাদার কথার উত্তরে বললেন, সেই তো ভাল। একেবারে যাত্রাশেষে ৺বাবার পায়ে প্রণাম জানিয়ে গড়িয়ে নাও যে যত পার।

ডাক্তারবাবু বললেন, যার যা ওষুধ লাগে, তুদিন ধরে দোব।

আমিও আশ্বাস দিলাম বেশ ভারিক্কি চালে, তানসেনের গুলী পাবেন, যার যত চাই।

বঙ্কুদাও কি যেনএকটা বলতে যাচ্ছিলেন, মধ্যম পাণ্ডবকে এগিয়ে আসতে দেখে নিজেই চুপ করে যান।

আবার সুরু হল চলা। এবড়োখেবড়ো রাস্তা, তার ওপর চড়াই।

যোশীমঠ থেকেই লক্ষ্য করেছি দুধের দাম ক্রমশ চড়ছে। আড়াই টাকা তিন টাকা সের। কেদারের পথে দুধটা সস্তা ছিল, এখানে কিন্তু চড়া দাম। দোকানীকে প্রশ্ন করে জানতে পারি ব্যাপারটা। এদিকে গরুমহিষাদি বেশী নেই। হোক দাম বেশী, টাটকা তো বটে। টাকা আনা পাই হিসেব করে তো খাওয়া যায় না।

কোথাও থীরু কেনে খোয়া ক্ষীর, কোথাও জিলিপী কেনে গুরুজী, কোথাও চট্টি চ্যাটার্জী কেনে চা, মধ্যম পাণ্ডব কোথাও কেনে পকৌড়ী, আর চা খাই না আমি, আমি কিনি দুধ। পা চলছে আর চলছে মুখ!

রসগোল্লাদা একটু একটু করে এগোচ্ছেন আর বসে পড়ছেন দম নিতে। 'ম' বাবু পিঠ চাপড়ে উৎসাহ দিয়ে বলেন, এই যে এসে গেছি। শুনে দু' পা চলেন, আবার বসে পড়েন। যাত্রা সুরু হবার গোড়ায় উনি ভীষণ হেসেছিলেন যাঁদের দেখে, এখন তাঁরা মুচকে হেসে পার হয়ে যান তাঁকে। দলের সবাই চলে গেল।

দল আর কি! ট্রেণ থেকে, ধর্মশালা থেকে দল সৃষ্টি হয়, তারপর যাত্রাশেষে জনারণ্যে হারিয়ে যায় সে দল। কয়েকদিনের জন্য আলাপ অথচ সহযাত্রীদের জন্য কেমন যেন একটা মমতা পড়ে অপরের। এত সামান্য পরিচয়ে যেখানে প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হতে দৃঢ়তর হয়, সেখানে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে সামান্য বচসা বা ভুল-বোঝাবুঝি হতে প্রীতির বন্ধন নিমেষে কেমন করে টুকরো টুকরো হয়ে যায়, জানি না। মানুষ যদি জীবনের চলার পথে বন্ধুর সঙ্গে একটু ভাল ব্যবহার করত, যদি একজন অপরের জন্য একটু ভাবতে পারত, একের দুঃখে যদি সর্বদাই অন্যের মনের তারে একটু সমবেদনার, একটু সহানুভূতির সুর বাজতো, তা হলে হয়ত বিশ্বব্যাপী অশান্তি-বিপ্লবের ইতি হত সহজেই।

অলকানন্দার গর্জ্জন ছাপিয়ে দূর থেকে টারজেনের ডাক ভেসে

এল। সাড়া দেবার ক্ষমতা কি লোপ পেয়েছে ? লোপ যে পায়নি, তা প্রমাণ করতে প্রত্যুত্তর দিই সে ডাকের।

বনানী তেমন ঘন নয় এখানে। দলে দলে লোক দর্শন সেরে ফিরছে।

এদিকের ডাণ্ডীওলারা হনহনিয়ে চলেছে। ওরাও দুদিন বিশ্রাম পাবে। তীরের কাছেই ছটফটানি বেশী—মাঝ দরিয়ায় হালে পানি পাই না যে !

পথের ধারে নলের জলে একটি পাহাড়ী বউ তার ছেলেকে সাবান মাখিয়ে স্নান করাচ্ছে। ছেলেটি পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছে অথচ ওর মা নির্ব্বিকার। আমার তো দেখেই শীত করছে, ঐটুকু ছেলে আর ঐ ঠাণ্ডা জল। এমন করে তৈরী না করলে ওরা কখনও এত কষ্টসহিষ্ণু হয় ! ওদের গড়নপিটনই আলাদা।

আরো খানিকটা যেতেই ৺বদরীনাথের মন্দিরের চূড়ো দেখা গেল। এবারে শুধু মুক্তোদাদা নন, সবাই বলে ওঠেন 'লাভলি'। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি সুরু হয়েছে। সাধুমাকে নামিয়ে দিয়েছে কাণ্ডীওলা। সাধুমা হেঁটে হেঁটে চলেছেন। প্রায় দু ফার্লং রাস্তা এখনও যেতে হবে। অতটা হেঁটে যাবেন দেখে কাণ্ডীওলাকে বলি মাইজীকে আরও খানিকটা পথ কাণ্ডী করে নিয়ে যেতে।

শুনতে পেয়ে সাধুমা বললেন, থাক বাবা, ওর দোষ নেই। আমিই নেমে পড়েছি। লোকের ঘাড়ে চেপে আসতে মন চায় না, কিন্তু শরীরও যে বয় না। এখন বাবা ৺বদরীবিশালের নজরের মধ্যে এসে পড়েছি, এ পথটুকু হেঁটেই যাব। ভজ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য……উনি এগিয়ে গেলেন।

আমি আর কিছু বলতে পারলাম না। এ অবস্থায় বলবার আছেই বা কি ! হেঁটে এলে যে পুণ্য বেশী হবে, এ বিশ্বাস দেখি অনেকের।

দর্শন সাঙ্গ করে ফিরে চলেছেন যাত্রীদল। মুখে তাদের বুলি 'জয় ৺বদরীবিশাল কি জয়'। একদল পেয়ে ফিরে চলেছে, অন্য দল

চলেছে পাবার আশায়। কখনও সহাস্য, কখনও বা নীরব অভিবাদন করি আমরা পরস্পরে।

ওই যে নদী দেখা যাচ্ছে। অলকানন্দার পুলের ওপর থেকে স্পষ্ট দেখা গেল মন্দিরের সোনার চূড়ো। আরও দেখা গেল খুপরীর মতো দোকান, বাজার, চটি, বসতি।

থীরু অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্যে। একসঙ্গে মার্চ করে পুরীতে প্রবেশ করা হবে। মাউথঅর্গানের সুর হিল্লোলিত করছে মনকে। আমাদের যাত্রাপথের শেষ চটিতে এসে এই প্রথম গুরুজী 'চল বেটা' ডাকের বদলে বললে, 'আও বেটা'। থীরু এন. সি. সিতে ছিল, আমাদের মার্চ করাতে করাতে নিয়ে চলল। আমি তো লাইন ভেঙ্গে নাচতে সুরু করে দিই।

আবেশবিহ্বল এই যাত্রীদলকে দেখে পথের দুধারে লোক স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। মামুলী যাত্রী দেখতে অভ্যস্ত ওরা। 'জয় বাবা ৺বদরীবিশাল কি জয়' ধ্বনিতে আকাশবাতাস মুখরিত হয়ে উঠল।

সাধুমার মুখে স্মিত হাসি, জন গিলপিন, চার্লি চ্যাপলিন, জাহাঙ্গীর, বঙ্কুদা, রসগোল্লাদা, জি. বি. এম. বি, শিলঙের মেজদা, হোমিওপ্যাথী ডাক্তার, নীলগেঞ্জী, ডাক্তারবাবু, কুমারডুবীর শ্রীকুমার, পিংখাড়ু, ঠাকুরপো, মুক্তোদাদা, বৌরাণী, রাঙাদি, এম, পি, দিদিমণি, মুক্তবৌদি, সিলিক ঠাকুরমা, নন্দগোপালবাবু ও তাঁর মা, নুরজাহান, বোষ্টমাসী ও অন্যান্য যাত্রীরা একে একে এসে পড়লেন সবাই। আগে পঞ্চপাণ্ডব, পেছনে আর সবাই।

পৌঁছেই আমার সঙ্গে কেউ কেউ ছুটল পোষ্টাফিসে, বাড়ীতে টেলিগ্রাম বা ট্রাঙ্ককল করবে বলে, একদল চলল মন্দিরে। গোধূলির ম্লান আলো তখন বদরীনাথ পুরীকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

সন্ধ্যে উৎরে যেতে দল বেঁধে মন্দিরে যাওয়া হল। পাথর বসানো রাস্তার দুপাশে ছোট ছোট দোকানে হাজার রকমের বেসাতি।

শিলাজিত, ফটো, বই, এলবাম যত, ততই পুরী, মেঠাই, বাসন ও তৈজসপত্রাদির দোকান। দস্তুর মত ভীড় ঠেলে এগিয়ে যেতে হয়। মেলা লেগেছে যেন।

'জয় বাবা ৺বদরীবিশাল'। এ কি দেখছি, ভুল নয় তো! না ভুল নয়। মন্দিরের সামনে সিংহদ্বারে নিয়ন ল্যাম্পে লেখা 'প্রবেশ'। ইলেকট্রিক এসে গেছে এখানে, তাই মন্দিরের প্রবেশপথ আলোয় ঝলমল। ওদিকে চোখ ফেরালে বরফ ঢাকা মিনার আর এদিকে নগর গড়ে তোলার প্রয়াস ইলেকট্রিক লাইট, ট্রাঙ্ককল ইত্যাদিতে।

পাণ্ডা অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্যে। সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে উঠতেই ডানদিকের একটা ঘরে দেখি নারায়ণস্তুতি হচ্ছে। কয়েকজন ভক্ত সাধু নামগান করছেন। শুনে মনে হল চীৎকার করে বলি, ঠাকুর, তুমি আছ, তুমি আছ, তুমি আছ। সংশয়ের দোলায় দোলে যার মন, তোমার পূত নামোচ্চারণে মুক্তি পায় সে। বৈষয়িক মন নিয়ে আসে যে জন, তোমার পবিত্র নাম গান করে তার হয় চিত্তশুদ্ধি।

বাঁধানো চত্বরের মাঝখানে মন্দির। বেশী উঁচু নয়, প্রায় ষাট ফিট হবে। সামনে কাঠের রেলিং দিয়ে যাত্রীদের সারিবন্দী হয়ে দাঁড়াবার ব্যবস্থা। লাইনে ঢুকে পড়ি এক এক করে। তারপর নাটমন্দির পেরিয়ে মূল মন্দিরে প্রবেশ করি। মাথার ওপর বিরাট এক ঘণ্টা। ঢং ঢং করে বাজিয়ে দিয়ে আমাদের আগমনবার্তা ঘোষণা করি। ঠাকুর বুঝি হাসেন।

যাঁকে দেখবার জন্যে এত আয়োজন, এত আয়াস, সেই তো আমার চোখের সামনে। ফুল, চন্দন আর ধূপধুনোর সুরভিতে সমস্ত জায়গাটা পূর্ণ। একটা কাঠের বেড়ার ওপাশে মস্ত এক রূপার থালা। পূজার অর্ঘ্য জমায়েত হয় তাতে। মূলমন্দিরে ৺বদরীনাথের আসন, রৌপ্য-সিংহাসন। মহামূল্য বস্ত্রাভরণে সজ্জিত মূর্ত্তি। অত রূপ যাঁর, কেমন করে দেখব তাঁকে। অলঙ্কারবিভূষিত হয়ে বিরাজমান তিনি। মূর্ত্তিটি বেশী বড় নয়। ভক্তির অঞ্জন দিয়ে দেখবার চেষ্টা করি।

পাণ্ডা বসে আছেন পাশেই এক গদীতে। ইনি বোধ হয় হেড পাণ্ডা। সামনে পেছনে লোক ঠেলা দিচ্ছে।

কি মশাই, ধাক্কা দিচ্ছেন কেন—ভুরু কুঁচকিয়ে বললেন জন গিলপিন। যাঁকে বললেন, তিনিও তাঁর ভাষায় কি একটা বলে জবাব দেন। কেউ কারও ভাষা বোঝেন না।

বৃথা তর্কে ফল হবে না দেখে আমি বললাম জন গিলপিনকে, চটছেন কেন? ধাক্কা খাওয়ার প্রয়োজন আমাদের সকলের আছে। প্রার্থনা করুন যেন চেতনার গোড়াটায় একটু ধাক্কা লাগে। একেবারে শেকড়ে নাড়া দিলে যদি ধর্মলক্ষণ প্রকাশ পায়।

উনি হাসলেন আর হেসে চুপ করলেন।

আরতি হবে একটু পরে। তার যোগাড় হচ্ছে। কোনমতে বেরিয়ে আসি ভীড় ঠেলে। পিংখাড়ু সঙ্গ নিলেন। বললেন, আচ্ছা, আপনি যে ধর্মলক্ষণের কথা বললেন, তা কি?

বললাম, ধার্মিকতার লক্ষণ হচ্ছে ধৃতি, ক্ষমা, আত্মসংযম, সততা, পরিচ্ছন্নতা, ইন্দ্রিয়দমন, ধী, বিদ্যা, সত্যপ্রিয়তা, অক্রোধ।

কথা বলতে বলতে মন্দির প্রদক্ষিণ সুরু হয়। মন্দির প্রদক্ষিণ করতে খালি পায়ে বেশ ঠাণ্ডা লাগছে, তাই মোজাটা পরে নিই। লক্ষ্মীর মন্দির, গরুড় মূর্ত্তি, গণেশ মূর্ত্তি দেখে চত্বরের একপাশে অবস্থিত মন্দিরের অফিস থেকে পূজোর ব্যয়বিধি জেনে নিই। একশ টাকা থেকে হাজার টাকার পূজোর ক্যাটালগ টাঙানো আছে একটি বোর্ডে।

ওদিকে কীর্তনের আসরে কীর্তন সুরু হয়ে গেছে। আরতির দেরী আছে, তাই কীর্তন শুনতে বসে যাই। বৌরাণী, মুক্তিবৌদি, এম. পি, 'ম' বাবু আগেই এসেছেন। 'শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব'—বীণা মহারাজের সুললিত কণ্ঠে সে গীত মধুর আবেশে ভরিয়ে দেয় মনকে। যাত্রী ভক্ত যে যেখানে আছে, যোগ দেয় সে গানে। তাঁর কণ্ঠে কণ্ঠ না মিলিয়ে থাকতে পারে না সে। একটার পর একটা গান চলেছে। বীণা মহারাজের স্বরচিত

গান। ওঁরই দেওয়া সুরে গাওয়া হয় নিত্য। 'আজা নন্দলালা, বদরীবিশালা, মিঠি মিঠি বংশী, শুনা দে গোপালা' শুনতে শুনতে মনে হয় ঐ বুঝি বেজে উঠল বাঁশরী ধ্বনি।

কি যে করব ভেবে পাই না। গান শুনব না শৃঙ্গার আরতি দেখতে যাব।

মুক্তোদাদা বললেন, চল আরতি দেখে আসি।

গুরুজী সায় দিল। উঠে পড়ি সবাই একে একে, চলি মন্দির পানে।

রাওয়ালজী অর্থাৎ প্রধান পূজারী যিনি, তিনি ছাড়া আর কেউ বিগ্রহ স্পর্শ করতে পারেন না। কয়েকজন অল্পবয়স্ক ছোট পুরোহিত প্রকাণ্ড প্রদীপের ছোট ছোট শিখাধারগুলি ঘি আর কর্পূর দিয়ে ভরিয়ে তুলছিল। শিখাগুলি জ্বলে উঠতে হঠাৎ আলোর ঝলকানি লাগে। একপাশে পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণ করছেন সাধুগণ, ঘণ্টা বাজছে ঢং ঢং করে আর সুদর্শন রাওয়ালজী হেলে দুলে অপূর্ব্ব নিষ্ঠার সঙ্গে আরতি করে চলেছেন। 'জয় বাবা ৺বদরীবিশাল'—প্রত্যেকের মুখে একই জয়গান।

মনে মনে বলি, হে ঠাকুর, ট্যুরিষ্টই হই, আর সাইটসিয়ারই হই, এ দেহ দীপাধারে অনাদি কাল হতে জ্বলছে যে ধর্মচর্য্যার শিখা, তাকে তো তুমিই জ্বালিয়ে রেখেছো। ভারতবাসী আমি, এ শিখা আমার গর্ব্বের বস্তু। সহস্র বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করে তোমার পায়ে নতি জানাতে এসেছে যে মানুষ, সে তো শুধু ট্যুরিষ্ট নয়। চোখে কালো-চশমা লাগিয়ে দৃশ্যশোভা উপভোগ করতে বেরিয়েছে যে জন, সে সাইটসিয়ার হতে পারে, তার বিশ্বাস আর একাগ্রতা, তার আত্ম-সমর্পণের আকিঞ্চনকে উপেক্ষা করে পারবে তুমি দূরে থাকতে! সে যে কালো চশমা দিয়েছে চোখে, সে তো কালো চশমার আড়ালে নিজেকে ঢেকে রাখতে নয়।

আরতি শেষ হল। অনুভব করি হৃদয়ের গহনে আনন্দে শুচিতায়

এক শাশ্বতী প্রশান্তি। তৃপ্ত হল মনের বাঞ্ছিত আশা। 'ভজ মন বদরী-বিশালা, নটবর গোপালা'—সুমিষ্ট রাগিণীতে ভজন চলেছে তখনও।

স্থান মাহাত্ম্য জেনে নিই পাণ্ডার কাছে। দূরের দুটি পাহাড় দেখিয়ে বললেন, ঐ হচ্ছে নর আর নারায়ণ পর্ব্বত। প্রসঙ্গক্রমে নর আর নারায়ণরূপে বিষ্ণুর তপস্যার কথা শোনালেন।

এম. পি. চটিতে ফিরে গেল। মন্দির থেকে দীর্ঘ সোপান শ্রেণী নেমে গেছে নীচে তপ্তকুণ্ডে। জলস্পর্শ করি সবাই। কাল স্নান হবে। অত ঠাণ্ডায়ও সে রাত্রে কারা যেন স্নান করছে বলে মনে হল। সিঁড়ির মুখেই দেখা হল গুজরাটিদের মেয়ে কমলির সঙ্গে।

কিছু বলবার আগেই নিজে থেকে হেসে বললে, অব তো উহ আ গয়ী।

উহ মানে আমাদের এম. পি.। সমবয়সী দুই বন্ধুতে নিশ্চয়ই দেখা হয়েছে। তরতর করে নেমে চলল তপ্তকুণ্ডে আর আমরা চটিপানে পা বাড়াই।

থীরু বললে, ওই দেখ, উনি হচ্ছেন জগৎগুরু।

সিঁড়ির মুখেই একটা প্রকাণ্ড ঘরে জগৎগুরু আশ্রয় নিয়েছেন। গৈরিক বসন পরিহিত দক্ষিণ ভারতীয় বেশ ফিটফাট সাধু। প্রাকৃতিক চিকিৎসায় পারদর্শী তিনি। থীরুর অনুরোধে ওঁর কাছে গিয়ে বসি। প্রসাদ দিলেন ইনি। নানা কথার মাঝে উনি বললেন, যদি পথে কোন রোগীর দেখা পাও, যাত্রীই হোক, আর এখানকার বাসিন্দাই হোক, তাকে বলো আমার কথা। রোগীর সেবা, আর্ত্তের সেবা, এই আমার জীবনের মহাব্রত। এই আমার মিশন্।

বেশ লাগল তাঁকে। মুগ্ধ হই আলাপ করে।

গুরুজী জিজ্ঞাসা করলে, আপনি কি এই কাজেই ৺বদরীনাথে এসেছেন?

শুধু ৺বদরীনাথে নয়, সকল তীর্থে আমার এই একই কাজ। ওদের মধ্যেই পাই ভগবানকে সেবা করার আনন্দ।

আরও কিছুক্ষণ বসে থাকবার পর উনি বেরিয়ে পড়লেন ওষুধের ব্যাগ হাতে। আমরাও 'আবার আসব' বলে উঠে পড়ি।

দূরে অন্ধকার ভেদ করে বরফঢাকা পাহাড়ের সুউচ্চ শীর্ষ দেখা যাচ্ছে আর দেখা যাচ্ছে ম্লানদীপ্তি আলো কোথাও কোথাও। বোধ হয় কোন কুটীর নিবাসী সন্ন্যাসীর আস্তানা হতে আসছে সেই আলো। রাত্রের অন্ধকারে একমাত্র নিশানা।

দোকানপাট তখনও খোলা। আগামী কাল তাদের ক্রেতা হব, এই আশ্বাস দিয়ে এগিয়ে চলি আমাদের আস্তানার দিকে। থীরু যাচ্ছে আগে আগে। ওর নিশ্চয়ই মুখস্ত হয়ে গেছে কটা ধাপ, কটা বাঁক।

চটিতে ফিরে আসতেই বি. বি. সি বললেন, বৌরাণী বটকেষ্টকে দিয়ে ডাকতে পাঠিয়েছিলেন আপনাদের।

ইস্, একেবারেই ভুল হয়ে গেছে। আজ বৌরাণীর বিবাহ বার্ষিকী। পঞ্চপাণ্ডবকে সন্ধ্যায় চা খেতে বলেছিলেন বটে, সে কথাটা মনেই নেই কারও।

চট্টি চ্যাটার্জী বললে, থীরুর জন্যেই তো। জগৎগুরুকে কাল দেখলে কি হোত।

গুরুজী বললে, যাক গে, এখন চল চটপট। কিন্তু খালি হাতে যাওয়াটা কি ভাল হবে।

খালি হাতে কেন, চট্টি চ্যাটার্জী অগুরুটা বের করো, তানসেন তুছত্র লিখে ফেল, আমি দেখি একটু ফুল পাওয়া যায় কি না—বলে থীরু ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল।

আমার হিজিবিজি লেখাটা গুরুজী তার সুদৃশ্য হস্তাক্ষরে লিখে ফেললে ডায়েরীর পাতা-ছেঁড়া একটুকরো পরিস্কার কাগজে। সব যোগাড় করে, থীরু ফিরে এলে চলল পঞ্চপাণ্ডব।

আমরা যেতে বৌরাণী খুব খুশী হলেন। বিস্কুট, জেলী আর মেঠাই দিলেন আমাদের। মধ্যম পাণ্ডব আমার লেখাটা আবৃত্তি করল,

জয় ৺কেদার, জয় ৺বদরী বিশাল,
(আজি) বৌরাণীর বিবাহ বার্ষিকী তিথি
(তাই) পঞ্চপাণ্ডব ধরিয়াছে গীতি
ভায়েদের সুরে বৌরাণী দেন তাল
জয় ৺কেদার, জয় ৺বদরী বিশাল ॥
(হেথা) তীর্থগামী যত ভায়েদের প্রীতি
(পরে) আনিবে যে এ লগনে মধুময় স্মৃতি
বাজাও মূরলী আর খোল করতাল
জয় ৺কেদার, জয় ৺বদরী বিশাল ॥

মূরলী আর কোথায় পাব? থীরু মাউথঅর্গান বার করল। খোলের বদলে মগ পিটিয়ে তাল দেয় চট্টি চ্যাটার্জী। ছোট উৎসব, কিন্তু বেশ ঘটা করে উদ্‌যাপিত হল। অনুষ্ঠানে ত্রুটি নেই। বৌরাণী এতটা আশা করেননি।

'ম' বাবু সেখানে ছিলেন। বললেন, অগুরুটা কাজে লাগবে। সেণ্ট ফুরিয়েছে তো আপনার।

মুক্তোদাদা বললেন, ঠিক বলেছেন।

হাসতে হাসতে ফিরে আসি নিজেদের ডেরায়।

আধো অন্ধকারে ঐ যে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের সামনে, ঐ তো নীলকণ্ঠ পর্ব্বত। হিমগিরি নীলকণ্ঠ যেন বদরীনাথকে আগলে রেখেছে। এর শীর্ষে আজও মানুষের পদচিহ্ন পড়েনি। একদিন হয়ত কাগজ খুলে দেখব কোন নয়া তেনসিং এর চূড়োয় বিজয়পতাকা প্রোথিত করে এসেছে।

রাত্রে খাওয়ার পর ডায়েরী নিয়ে লিখতে বসি। জানালাটা বন্ধ করে দিয়েছি ঠাণ্ডার ভয়ে। ইচ্ছে হয় খুলে দিই অর্গল, নয়নে লাগুক স্বর্গের শোভা। মনে হয় খুলে দিই মনের অর্গল, হৃদয়তন্ত্রী আনন্দের সুরলহরী তুলুক।

নন্দগোপাল বাবুর মায়ে সঙ্গে নুরজাহানের ছোটখাটো একটা বচসা

...মন্দিরের সামনে সিংহদ্বার—পৃঃ ১২৯

...স্পষ্ট দেখা গেল দোকান, বাজার, চটি, বস্তি—পৃঃ ১২৮

হয়ে গেল খুব চাপাস্বরে। জাহাঙ্গীর ব্যাপারটাকে সহজ করে দেবার চেষ্টা করছেন। রসগোল্লাদা অনেক কষ্ট করে শেষ পর্য্যন্ত যে আসতে পেরেছেন, সে কথা সবাইকে শুনিয়ে আনন্দ পাচ্ছেন।

যত আশা নিয়ে আসা, তা কি মিটল! ভাবতে ভাবতে লেখা বন্ধ করে শুয়ে পড়ি। কানে ভাসে অলকানন্দার একটানা কলস্বর। তার অবিশ্রান্ত স্রোতধারায় যেমন ধুয়ে মুছে যায় পাথরের মালিন্য, তেমনি ধীরে ধীরে মনের মধ্যে থেকে সরে যেতে থাকে ভাবনা চিন্তার রাশি। লেপের নীচে চুপটি করে শুয়ে থাকতে থাকতে তু' চোখের পাতা জুড়ে আসে একেবারে।

ভোরে চোখের পাতা খুলতে দেখি অরুণ আলোর অরুণিমায় ভাসছে সমস্ত বদরীনাথপুরী। তুষারশুভ্র পর্ব্বতের চূড়ো দিনমণির কিরণস্পর্শ পেয়ে নানা রঙের খেলার মাঝে খুশীতে যেন ফেটে পড়ছে। তার খুশীমাখা হাসির টুকরো ছড়িয়ে পড়ছে সবুজ প্রান্তরে, নদীর জলে। অলকানন্দার উচ্ছ্বাস যেন বাধা মানে না।

আমার আগেই অনেকে উঠেছেন। পাশের ঘরে বঙ্কুদার চেঁচামিচি শোনা গেল। সামান্য ব্যাপারে হৈ চৈ সুরু। রাত্রে কে বুঝি বাইরে যাবার সময় ভুল করে তাঁর লাঠিটি নিয়েছিল, কিন্তু ঠিক জায়গায় রাখেনি; তাতেই প্রলয় কাণ্ড।

ঠাকুরপো বললেন, লাঠি হারায়নি তো।

রসগোল্লাদা বললেন, যেতে দিন না মশাই।

বঙ্কুদা কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, থীরু বললে, চেপে যাও বঙ্কুদা।

তপ্তকুণ্ডে ভীড় ঠেলে স্নান করতে হল। জল ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করে না। অথচ ঠাণ্ডা লাগবার ভয় আছে। তাই জল ছেড়ে উঠে আসতে হয়। জনকয়েক লোক এত হুটোপাটি করছে স্ফূর্তিতে যে শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে' পাণ্ডা একনাগাড়ে সঙ্কল্পের মন্ত্র আউড়ে চলেছেন।

স্নান সেরে পূজো। আমাদের পাণ্ডাটি অতি সজ্জন। নিজে ও তাঁর দুই ছেলে, এই তিনজনে মিলে অতগুলি লোকের তদারক করছেন। হিসেবে কোথাও গণ্ডগোল নেই। যার যেমন সাধ্য, তার জন্যে তেমনি পুজোর আয়োজন করে দিচ্ছেন।

গতকাল রাত্রে দেখে গেছি নয়নাভিরামকে। আজকের দেখা বুঝি স্বতন্ত্র। মন্দিরে ভীড় হয়েছে খুব, কিন্তু ব্যবস্থা চমৎকার। একদল পূজো সেরে পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলে আর একদল অন্য দরজায় প্রবেশানুমতি পায়। সামনের রূপোর থালায় আমাদের অর্ঘ নিবেদন করি, আর প্রসাদ নিই ভক্তিভরে। মন চায় না চলে আসতে, ইচ্ছে করে আরও খানিকক্ষণ থাকি, কিন্তু অন্যান্য যাত্রীর মুখে 'জয় বাবা ৺বদরীবিশাল' শুনে মনে হয় এবারে ওর পালা এগিয়ে আসবার।

গুরুজী আমার কানে কানে বললে, কামনা বাসনার উর্দ্ধে নই আমরা। কি চাওয়া যায় বল দেখি।

আমি বললাম, বলতে গেলে কথাটা আধ্যাত্মিক শোনাবে, কিন্তু সত্যিই বল তো, অন্তর্যামীর কাছে চাইবার কিছু আছে কি। কি চাইবে আর কতটা চাইবে। হয়ত চেয়ে কিছু পেলে, তাকেই কি রাখতে পারবে? এই চাওয়া কি শেষ চাওয়া?

ঠিক বলেছ। এস, এই কোণটায় দাঁড়িয়ে প্রাণভরে দেখে নিই।

একপাশে সরে দাঁড়াই আমরা। কারও মুখে কথা নেই।

পিণ্ডদানের পালা সারতে চললেন অনেকে ব্রহ্মকপালীতে। এখানে পিণ্ডদান করলে গয়া প্রয়াগাদি ক্ষেত্রে পিণ্ডদান করবার প্রয়োজন হয় না। কলরবমুখরিত মন্দির প্রাঙ্গনে কিম্বা পথে আর পথের প্রান্তে, সর্ব্বত্রই ব্যস্ততার লক্ষণ। আজকে সমস্ত দিনের মধ্যে সব দেখে চিনে নিতে হবে। নাই, নাই, সময় যে নাই।

মন্দির থেকে চটিতে ফিরে জলযোগ সেরে আবার দলে দলে সব বেরিয়ে পড়ি। একদল চলল বসুধারা, একদল মৌনীবাবার কুটির,

একদল দোকান বাজারে সওদা করতে, একদল অবধূতবাবার আশ্রম। গাইডবুকের দরকার হয় না। নিজেরাই প্রোগ্রাম করে ফেলি।

বদরীনাথপুরী থেকে দু মাইল দূরে মানা গ্রাম। অলকানন্দার অপর পারে মানা গ্রাম থেকে রাস্তা গেছে বসুধারা প্রপাতের দিকে। তিন মাইল চড়াই রাস্তায় যেতে কষ্ট হয়—পাণ্ডার সঙ্গে যাওয়াই শ্রেয়ঃ। প্রপাতে জল চারশ' ফিঃ উঁচু থেকে পড়ছে অবিশ্রান্ত ধারায়। দেখতে দেখতে বিমোহিত হয় মন। অসুবিধেকে তুচ্ছ করে এগিয়ে যায় যাত্রী।

বি. বি. সি বললেন, এত পরিশ্রম করে এসে আবার কেন চড়াই ভাঙ্গতে যাওয়া। সাধুরা যেখানে আছেন থাকুন, তাদেরই বা বিরক্ত করতে যাওয়া কেন।

নন্দগোপালবাবুর মা বললেন, তা বললে ওরা শুনবে কেন। ছেলেমানুষ ওরা, এই তো ঘুরে বেড়াবার বয়স।

শিলঙের মেজদার মা বললেন, ঠিকই বলেছেন দিদি। ওরা ঘুরে এলে আমাদেরই তো লাভ। আমরা ঘরে বসেই ওদের কাছে গল্প শুনে, বেড়ানোর আনন্দ পাবো।

বি. বি. সি বললেন, তা হলেও মানুষের শরীর তো। অত ধকল কি সইবে। তাই বলছিলুম একটু বিশ্রাম নিলে ভালই হত।

গুরুজী বললে, আমরা শরীরপাত করে বাহাদুরী নিতে চাই না। যতক্ষণ শরীরে বয়, যতটা পারি ঘুরে নিই।

বাগনানের দিদিমা আমার দিকে চেয়ে বললেন, অ ছেলে, তুমি অত কি লেখো বলদিকিনি। এ সব কথা লিখছো তো। আজ সন্ধ্যেবেলায় আমাদের পড়ে শোনাও দিকিনি।

জবাব দিই, এখন নয়, শেষ হলে শোনাব। শুধু আপনাকে নয়, সকলকে শোনাব। যদি কোনদিন প্রকাশিত হয় এ লেখা, তবেই মনস্কামনা পূর্ণ হবে।

এই বলে বেরিয়ে পড়ি আমরা। কানে বাজে বি. বি. সি-র

স্নেহার্দ্র কথা নন্দগোপালবাবুর মায়ের সস্নেহ উৎসাহবাণী। এ পাওয়াটাও তো কম নয়।

দূরে পাহাড়ের কোলে একটি দুটি কুটীর। নশ্বর দেহকে তুচ্ছ করে জনমানবহীন এই সাধনপীঠে কৃচ্ছ্র্সাধন করেন যে তপস্বীরা, তাঁরা কতখানি অতিপ্রাকৃত শক্তি অর্জন করতে পারলেন জানতে ইচ্ছে করে, তাই ছুটে চলি তাঁদের কাছে।

মৌনী বাবার ছোট কুটিরের কাছে এসে কিন্তু সব কথা হারিয়ে যায়। বারোমাস এই দুর্গম গিরিশিখরে থাকেন তিনি। শীতের ছমাস যখন ৺বদরীনাথের পূজার্চ্চনা হয় যোশীমঠ থেকে, যখন বরফে ছেয়ে থাকে সারা অঞ্চল, তখনও তিনি থাকেন এখানে। ইনি সিদ্ধপুরুষ। কথা বলেন না। নির্জনে কার সঙ্গেই বা বলবেন।

একটি পাত্রে পানীয় ঢেলে খেতে দেন আমাদের। কিন্তু ও কি, গুরুজী অমন টলছে কেন! ও কি, নাক দিয়ে অমন রক্ত পড়ছে কেন!

খানিকপরে একটু সুস্থ হ'তে গুরুজী হেসে বললে, ও কিছু নয়। সাধু সন্ন্যেসীদের জিনিষ আমাদের সইবে কেন।

প্রণামী নিতে চাইলেন না। ইসারায় কাঠ কিনে পাঠিয়ে দিতে বললেন। অর্থে তাঁর প্রয়োজন নেই, আসক্তিও নেই। এঁকে দেখে ভক্তি তো হয়ই, এঁর কথা শুনলেও বোধ করি ভক্তিতে নত হয় মন। নীচে কাঠওলাকে কাঠের দাম চুকিয়ে জ্বালানীকাঠ ওঁর কাছে পাঠাতে বলি। এমনি ভাবে ওঁর কাছে প্রণামী দেওয়ার রীতি কাঠওলার অজানা নয়।

ফিরে আসতে আসতে গুরুজী বললে, একটা যা জিনিষ খেয়েছি, এর আগে অমন কখনও খাইনি। বিউটিফুল টেষ্ট।

কি রকম স্বাদ, সেটা কিন্তু গুরুজী আর কিছুতেই বোঝাতে পারল না; বলতে পারল না, কেন শরীর টলেছিল।

জন গিলপিনের সঙ্গে দেখা হল মন্দিরের কাছে একটি দোকানে।

অনেক ছবি কিনেছেন। আমরা চটিতে চলেছি দুপুরের খাওয়া সেরে নিতে।

একটি ছোকরা সাধু এসে বললে, বাবু, আমাকে একজোড়া জুতো কিনে দেবেন?

তাকিয়ে দেখি তার সমস্ত পায়ে ঘা আর হাজা।

জন গিলপিন তাকে দু আনা পয়সা দিতে গেলে সে তা প্রত্যাখ্যান করে বললে, আমি জুতো চেয়েছি, পয়সা নয়।

বা রে সাধু!

থীরু বললে, খুচরো পয়সা জড়ো করলেই তো জুতো কেনার পয়সা হয়। তা ছাড়া জুতোরই বা অত শখ কেন।

আশ্চর্য্য, লোকটি তবু পয়সা নিলে না।

চট্টি চ্যাটার্জী বললে, খুচরো পয়সা গাঁজা খেয়েই উড়িয়ে দেয় বোধ হয়।

চার্লি চ্যাপলিন কয়েক আনার জিলিপি কিনে মন্দিরের নীচে বসে থাকা লোকগুলিকে বিতরণ করলেন। ওরা তাতেই খুশী।

খাওয়াদাওয়া সেরে আবার বেরিয়ে পড়ি। রোদের তেজ বেশ, তবু শীতের দিনে (মে মাসেও শীত) ঘরে বসে থাকতে মোটেই ভাল লাগে না। থীরুর মাউথঅর্গানে সুর বাজে 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু'।

পুল পেরিয়ে ওপাশে অবধূতবাবার আশ্রম। ছোট একটি পাথরের ঘরে একপাশে একটি কাঠের বাক্সের ওপর ওঁর আসন। অন্য একপাশে কিছু তৈজসপত্র। গুজরাটিদের মেয়ে কমলি এসেছে, এসেছে রাজস্থানী, দক্ষিণ ভারতীয় কয়টি বৌ-ঝি। পিংখাড়ুকে সামনে রেখে ওঁর সঙ্গে হিন্দীতে আলাপ করে খুশী হই। কিছু কিছু রাজনীতির আলোচনাও চলে। উনি এত খবর রাখেন কি করে ভেবে অবাক হই। থীরু আর মধ্যম পাণ্ডব ছবি তোলে একটার পর একটা।

পি. ডবলিউ. ডি বাংলোর কাছে ছোট একটি হ্রদ। প্রাকৃতিক

হ্রদের নিজস্ব একটা শ্রী আছে। হ্রদের একপাশে পায়ে চলা ছোট পথ এঁকেবেঁকে গেছে দূরে বস্তির দিকে। সে পথে যাওয়া আসা করছে কয়েকটি স্থানীয় কিশোরী। কলহমানা অথচ সলজ্জ। ভাষা দুর্ব্বোধ্য হলেও তাদের কলহটা উপভোগ্য।

শুনেছি এখানে একজন ব্যারিষ্টার সাধু আছেন। তাঁর কাছে আর যাওয়া হল না।

বিকেল গড়িয়ে আসে। এপার থেকে ভাল করে বদরীপল্লীটা দেখে নিই। কত যে ছবি দেখেছি এর। এবারে ছবি এঁকে নিয়ে চলেছি এমন নেগেটিভে, যা অন্যকে দেখানো যায় না, কিন্তু চেষ্টা করলে লিখে বর্ণনা করা যায় বোধ হয়। তাই তো ডায়েরীর পাতা ভরে ওঠে।

নদীর তীরে ভীড় দেখে থমকে দাঁড়াই। লোকে লোকারণ্য। সকলের দৃষ্টি যে দিকে, সে দিকে চোখ ঘুরিয়ে দেখি একটি শবদেহকে ঘিরে জনকয়েক লোক। মনে পড়ল এদের একজনকেই কাল মন্দির প্রাঙ্গনে অসুস্থ বৃদ্ধ পিতাকে কাঁধে করে নিয়ে যেতে দেখেছি। বৃদ্ধটি বোধ হয় দেহ রাখলেন।

সৎকার হবে। অশ্রুসজল চোখে ধারা নামে—বিচ্ছেদের ধারা। বিচ্ছেদ, বিরহ, বিয়োগব্যথা। শবটিতে মুখাগ্নি করলেন একজন। মুখাগ্নি অর্থে মুখে আগুন স্পর্শ। তারপর একজন ধরলেন হাত আর একজন ধরলেন পা এবং 'সীয়ারাম সীয়ারাম' বলতে বলতে শবটিকে দুলিয়ে ছুঁড়ে দেওয়া হ'ল নদীবক্ষে—অলকানন্দার প্রচণ্ড ক্ষুধায় বুঝি আহুতি পড়ল। মুহূর্তে স্রোতের টানে ভেসে চলল শব—কিছুক্ষণ পরে চলে গেল দৃষ্টির অন্তরালে। এই সৎকার।

কত আশা, আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এসেছিল মানুষটি। বাবা ৺বদরী-নাথের অজস্র করুণা তার ওপর। তাকে দেখা দিয়েই নিজের কাছে টেনে নিলেন। ওপারের হাতছানি পেয়ে শান্তি পেল যাত্রী। শান্তির আনন্দলোকে হল তার যাত্রা সুরু। পায়ে চলা পথ যেখানে হয়েছে

শেষ, সেখানেই পড়েছে শেষ নিঃশ্বাস। লোকটি পুণ্যবান, অক্ষয় বৈকুণ্ঠলাভ বুঝি হল তার।

ফিরে আসি আবার চটিতে। একটু বিশ্রাম। পাণ্ডা প্রসাদ দিয়ে গেছেন। পরম তৃপ্তির সঙ্গে খেলাম সবাই। কত জায়গা আছে দেখবার—সব আর দেখা হয়ে ওঠে না। সন্ধ্যারতি দেখতে যাবার উদ্যোগ করি সকলে। মুক্তোদাদা এ ব্যাপারে অগ্রণী। আমাদের একরকম তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। মেয়েরা একবার ঠেক খেলে আর নড়তে চান না। এই নিচ্ছি, এই যাচ্ছি করে দেরী হয়ে যায়।

মনটা খুশীতে ভরপুর। যাত্রাশেষের বিষণ্ণতাকে চাপা দিয়ে আনন্দানুভূতি ছাপিয়ে উঠছে মনের কানায় কানায়। কত সতর্কতা, কত সাবধানতা এখানে আসবার জন্যে, আর যেই পৌঁছে গেছি অমনি তার প্রয়োজন ফুরোয়। হাঁটুর ব্যথা, কোমরের ব্যথা, সব যেন ধুয়ে যায় স্বতঃস্ফূর্ত খুশীর জোয়ারে।

আরতি দেখি, ভজন শুনি, তারপর চলে আসি দোকানে। কাল আর সময় পাব না। দেওয়ার লোকের তো অভাব নেই, তাই ডজন দরে কিনে নিই ছবি, পট, এ্যালবাম, তামার পাতে তোলা মূর্ত্তি।

বঙ্কুদার কোন জিনিষটাই আর পছন্দ হয় না। আমাকে বললেন, দিন না ভাই একটু দেখে।

ছবি বাছতে বসে জমে যাই। সঙ্গীরা এগিয়ে গেল। বঙ্কুদা খুশী হলেন বাছাই করা ছবি পেয়ে।

বললেন, এর পুরস্কার কি জানেন।

কি ?—আমি শুধাই।

মিষ্টান্ন। দেশে আমার মস্ত বড় খাবারের দোকান। অবশ্য রসগোল্লার টিন নিয়ে জাঁক করবার মত নয়—রসগোল্লাদার প্রতি ইঙ্গিতটা সুস্পষ্ট তাঁর কথায়।

বললাম, সে এখানে পাচ্ছি কোথায়।

এখানে নয়। আমাদের দেশের বাড়ীতে একবার পায়ের ধুলো দিতে হবে। ষ্টেশনে নেমে যাকে বলবেন, সেই বলে দেবে।

ওকথা বলছেন কেন, নিশ্চয়ই যাব।

থাকতে হবে কিন্তু—বঙ্কুদার ভেতরকার অতিথিবৎসল মানুষটির আত্মপ্রকাশ হল।

ভারী ভাল লাগল তাঁকে। 'চেপে যাও, বঙ্কুদা' বলতে ইচ্ছে হল না। আমি যাব শুনে খুশী হলেন তিনি।

রাত্রে বসি ডায়েরী নিয়ে। কত কথা মনকে তোলপাড় করে।

কত পাহাড়! ভারতের বিভিন্ন প্রান্তসীমা থেকে সমুদ্রকে দেখেছি। বোম্বাই থেকে স্থুরু করে কোচিন, কন্যাকুমারিকা, ধনুস্কোডি রামেশ্বর, পণ্ডিচেরী, মাদ্রাজ, বিশাখাপত্তনম, পুরী, দীঘা, কাকদ্বীপ—কত জায়গায় কত ভাবে দেখেছি। দেখেছি তরঙ্গলীলার তত্ত্ব, ঘন, ওঘ। এখানে দেখলাম আর এক তরঙ্গ। মেদিনীপ্রসূত পাহাড়ের সংখ্যাতীত তরঙ্গ। মৌন, স্থির অথচ গম্ভীর; যেন এক অদৃশ্য নায়কের ইঙ্গিত পেয়ে স্তব্ধ হয়ে আছে। ইসারা পেলেই বুঝি প্রকম্পিত করবে ভূমিকে, মূলে করবে আঘাত।

জলভারে নত মৌস্থুমী বায়ু ধাক্কা খায় এখানে। ঋতুচক্রের পরিবর্তন হয় নিয়মমাফিক। বরফ জমে, বরফ গলে। প্রকৃতির অকৃপণ হাতের দান ছড়িয়ে থাকে গবেষকদের গবেষণার বিষয় বস্তু হয়ে।

আর একটা রাত কাটল।

ভোর থেকে স্থুরু হয় যাবার উদ্যোগ আয়োজন। 'ম' বাবুই সবচেয়ে বেশী খুশী হন এতগুলি লোকের বন্দোবস্ত করে দিতে পারবার আনন্দে। পাণ্ডা অতিশয় সজ্জন। এমন ভদ্র আলাপী পাণ্ডার সঙ্গে পরিচিত হব, ভাবিনি। সাধ্যমত প্রণামী দিই; হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করে স্থুফল দিলেন তিনি। আর দিলেন ছোট ছোট গাইড বই আমাদের প্রত্যেককে।

নীলকণ্ঠ-কে দেখে নিই প্রাণভরে। সৃষ্টির শেষ সীমানায় যেন অতন্দ্র প্রহরী। প্রভাতের রক্তিমাভা ওকে চুম্বন করে আর কিরণ উদ্ভাসিত মঞ্জিমায় স্মিত কলেবর দেখিয়ে নীলকণ্ঠ পর্বত যেন মনে মনে যাত্রীর কাছ থেকে প্রতিজ্ঞা আদায় করে নেয় এপথে আসবার জন্যে আবার, বারবার। অপলক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে মনে মনে আমরাও বলি, ফির মিলেঙ্গে।

অতীন্দ্রিয় জগত থেকে নেমে আসি মর্ত্যলোকে।

গুজরাটিদের মেয়ে কমলি এসেছে আমাদের চটিতে। এম. পি-কে খুঁজছে। মন্দিরে গেছে এম. পি.। তাই শুনে বেণী দুলিয়ে যেমন এসেছিলো, তেমনি চলে গেল সে। একটু পরে আবার এল এম. পি-কে নিয়ে সঙ্গে করে। ওদের কথায় জানতে পারি, আরও একদিন এখানে থেকে ওরা তীর্থে বাস করার রীতিকে মানবে।

একসময় আমরা নেমে চলি তরতর করে। লামবগড় চটিতে দুপুরের খাওয়া সেরে পাণ্ডুকেশ্বরে রাত্রিবাস।

পরের দিন পাণ্ডুকেশ্বর থেকে রওনা হলাম যোশীমঠের দিকে। মনে মনে গান ভাঁজতে ভাঁজতে চলেছি। কবিমন যখন জেগে ওঠে, তখন পারি না তাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে। মনের মধ্যে যে বাউল বাস করে, সে যে ছটফট করে নিজেকে প্রকাশ করবার জন্য। কি করব!

ঘাট চটিতে দেখা হল মিঃ দের সঙ্গে। গরম জিলিপী আর আলুর তরকারী খাওয়া হল। ঐখানেই দেখা হল দিল্লীর মিঃ গুপ্ত-র সঙ্গে। একমনে সপরিবারে উপভোগ করছিলেন আমাদের ঠাট্টা তামাশা।

গুরুজী বললে, আর গুনগুনিয়ে কেন, গলা দাও।

পিংখাড়ু বললেন, বাগান দেখলেই দেখি গান এসে যায় আপনার। সুরু করুন।

মিঃ গুপ্ত উঠে এসে হাত দুটি ধরে বললেন, হাঁ হাঁ, সুরু কিজিয়ে।

কেমন যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত গান ধরি নিজস্ব সুরে,

ও ভোলা মন,

কেমন ধারা দেখলি রে তুই ৺বদরী নারায়ণ,

(সেথা) ইলেকট্রিকের বাতি জ্বলে সন্ধ্যে হলে পরে

(আর) পাণ্ডা আসেন ঘরের ভেতর সুফল দেবার তরে।

(তারে) দক্ষিণাদি অল্প দিলেও হয় মনের মতন

ও ভোলা মন……

(সেথা) মন্দিরেতে বিরাজ করেন ৺বদরী বিশালা

(আহা) রূপ যেন তাঁর ফেটে পড়ে নয়ন উজিয়ালা

তাঁরই পায়ে সঁপে দে রে তোর এই জীবন

ও ভোলা মন……

সমবেত কণ্ঠের উচ্ছ্বসিত সোল্লাসের অভিব্যক্তি চটিতে বিশ্রামলব্ধ সকলের মুখে। মুক্তিবৌদি, দিদিমণি, রাঙাদি সবাই হাসছেন আমাদের কাণ্ডকারখানা দেখে। কাণ্ডকারখানাই বটে। গানের সঙ্গে নাচ, বাজনা, কিছুই তো আর বাদ নেই। অবশ্য কুৎসিত কুরুচিকে কুমেরুতে রেখে সুরুচির সুনিবিড় সান্নিধ্যেই থাকি আমরা।

মিঃ গুপ্ত বললেন, এইসা কভি নেহি দেখা।

আবার সুরু হয়েছে পথ চলা। বলদোয়েড়া চটিতে এসে অনেকে হাঁটতে চাইলেন না। অগত্যা 'ম' বাবু রয়ে গেলেন দলের সঙ্গে। আমরা কয়েকজন এগিয়ে চলি।

বলদোয়েড়া পেরিয়ে বিষ্ণুপ্রয়াগ। ওয়াটার বটলে জল ফুরিয়েছে, তাই জলের খোঁজে নলের দিকে এগিয়ে এলাম আমরা। পি. ডবলিউ. ডি-র নল রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা নীচে। লেমনজ্যুস আর কাপ বেরুল চট্টি চ্যাটার্জির ব্যাগ থেকে।

নলের ধারে বসে একটি লোক বাসন মাজছিলো, পরণে তার লেংটি। হঠাৎ অকথ্য ভাষায় লোকটি আমাদের ওখান থেকে চলে

যেতে বলল। সারা পথে দেখেছি এই লোকগুলিই সাধু সেজে থাকে এবং ভিক্ষে করে। আমরা অবাক হলাম তার ব্যবহারে।

মধ্যম পাণ্ডব বললে, দোব নাকি দু ঘা কষিয়ে ?

গুরুজী বাধা দিয়ে বললে, না। তার চেয়েও চল, আমরা যোশীমঠে পুলিশকে রির্পোট করে দোব। এ যে রকম অসভ্য লোক, মেয়েদেরও অপমান করতে পারে।

থীরু অবশ্য তাকে বেশ করে শাসিয়ে দিলে।

পাকদণ্ডী পথে চড়াই উঠতে বুকে হাঁফ ধরে যায়। তবু বিষ্ণুপ্রয়াগ থেকে যোশীমঠ পুরো পথটাই পাকদণ্ডী বেয়ে উঠি।

লেমনজ্যুসের জোর আছে বলতে হবে, বললেন পিংখাড়ু।

গুরুজী বললে, এ হচ্ছে ভক্তিজ্যুস। এটি না থাকলে বাপু, পঙ্গুং কখনও লঙ্ঘয়তে গিরিম ?

কুমারডুবীর শ্রীকুমার, বঙ্কুদা, খদ্দরের সার্ট, আরও অনেকে এসেছেন আমাদের সঙ্গে বলদোয়েড়াতে না থেমে। কুণ্ডে স্নান সেরে আহার। এখান থেকে বাস পাওয়া যাবে। কিন্তু অসম্ভব ভীড়ের জন্য শেষ পর্য্যন্ত স্থির হল আমরা রাত্রিবাস করব সামনের চটিতে। সুতরাং দল বেঁধে চলে আসি সিংধারায়। ছড়িদার রইল অন্য লোকদের সে কথা জানাতে, যাঁরা আসছেন পেছনে পেছনে।

মিঃ গুপ্তও সদলবলে চলে এসেছেন। জায়গা পাচ্ছিলেন না দেখে রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা উঁচু একটা পরিত্যক্ত বাংলো-বাড়ীতে ওঁদের থাকবার বন্দোবস্ত করে দিই আমরা। মিঃ গুপ্ত আমাদের চায়ের নেমন্তন্ন করলেন। যাত্রীদের আনাগোনার ভিড় ঠেলে চায়ের নেমন্তন্ন রাখতে যেতে হয়। দূর থেকে যেটাকে ভাল মনে হচ্ছিল, কাছে এসে দেখি সেটা তত ভাল নয়। বুনো ঘাস আর জংলা গাছ জমে আছে এখানে সেখানে, কিন্তু ইতিমধ্যে তাকে বাসযোগ্য করে তুলেছে আশ্রয় অনুসন্ধানী কয়েকটি যাত্রী। কালই চলে যাবে সব, তবু কষ্ট করে পরিষ্কার করে নিতে হয়েছে।

থীরুর মাউথঅর্গানের মন মাতানো সুর আমাকে প্রলুব্ধ করে নাচের তালে তালে সে সুরকে স্থায়ী স্বীকৃতি দিতে আর আমার নাচ দেখে মিঃ গুপ্তর মেয়ে গান না গেয়ে পারেন না।

এক মধুময় সন্ধ্যায় শহরবাসীর মন নির্জন প্রান্তরে স্বাক্ষর রেখে যায় তার অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-প্রাপ্তির। আমরা যাত্রী, আমরা ট্যুরিষ্ট, আমরা সাইটসিয়ার। সমস্ত সঙ্কোচের মুখোস খুলে, সমস্ত দ্বিধার বর্ম সরিয়ে আমরা আনন্দ করেছিলাম ; নির্মল, অমলিন সে আনন্দের জোয়ারে ভেসে গেছল সন্দেহের কুটো, পরশ্রীকাতরতার তৃণ।

উল্লসিত মন নিয়ে নেমে এলাম আমাদের ডেরায়। অন্ধকারে সাবধানে পা ফেলতে ফেলতে নামি, তবুও হোঁচট খেলাম দু একবার।

চট্টি চ্যাটার্জী বললে, কেউ বোধ হয় নাম করছে।

ঠিক তাই। 'ম' বাবু ব্যস্ত হচ্ছিলেন আমাদের না দেখতে পেয়ে।

কোথায় ছিলেন পঞ্চপাণ্ডব ?—জিজ্ঞাসুনেত্রে আমাদের দিকে তাকান তিনি।

গুরুজী বললে, হারিয়ে যাইনি। গুপ্ত-বাস হচ্ছিল।

মানে ?

মানে, মিঃ গুপ্তর ওখানে চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল।

একটু বলে যেতে হয় তো! চা নষ্ট হলো কতটা।

বেশ, বলেই দিচ্ছি আগে থেকে। আজ রাত্রে আমরা কেউ খাব না,—গম্ভীর হয়ে বলি।

কেন ভাই, রাগ করলেন আমার কথায়—উনি হতভম্ব হয়ে যান আমাদের কথায়।

এর জবাব পরে দোব—বলে আমি গুরুজীকে ইসারা করি কিছু না বলবার জন্যে।

'ম' বাবু চলে গেলেন। থীরু আর মধ্যম পাণ্ডব গেল থানায় ডায়েরী করতে। গুরুজীর সাবধান বাণী হল, যেন লিখিত কোন রিপোর্ট না করা হয়।

আগেই বলেছি, 'ম' বাবুর সঙ্গে যাওয়াতে আমাদের হাঁটা ছাড়া কোন কাজ ছিল না। আমার সঙ্গে যে ঘিয়ের শিশি তুটো ছিল, তার একটাতে সারা রাস্তা হাত পড়েনি। পেস্তা, বাদাম, কিসমিস তখনও রয়ে গেছে সকলের কাছে একটু একটু। অনেক যাত্রীকেই সারারাস্তা রান্না করে খেতে দেখেছি। তা ছাড়া চটিতে কি পাওয়া যায়, না যায়, সে সম্পর্কে নিজেদের অভিজ্ঞতাও কিছু সঞ্চয় করা দরকার।

মনে মনে যে কথা ভাবছিলাম পথে আসতে আসতে, সে কথাটা ওদের জানাতেই ওরা সব রাজী হয়ে যায়। ঠিক হয় আজ রাত্রে সিংধারায় আমরা স্বপাকে খাব। ঘি-ভাত, আলুর তরকারী, আলু-ভাজা আর চাটনী। দলের অন্যান্য যাত্রীদের চমকে দেবার লোভও ছিল।

চটিওলার কাছে সব পাওয়া গেল। কাঠের আগুন ধরাতে গিয়ে চোখমুখের যা চেহারা হল, তা আর বলবার নয়। ফুঁ দিয়ে দিয়ে গালে ব্যথা হল, চোখ হল জবাফুলের মত লাল, জল পড়ল চোখ দিয়ে অবিরল ধারে, শেষে উনুন ধরল। তবে ঘি-ভাত হতে দেরী লাগে না, এই যা রক্ষে! পঞ্চপাণ্ডব কেবল নিজেদের জন্যেই খাবার তৈরী করেনি। পুরো একহাঁড়ি ঘি-ভাত 'ম' বাবুর টিমের প্রত্যেককে ভাগ করে দেওয়া হল এক হাতা তু হাতা করে। পরিবেশন করলাম গুরুজী আর আমি।

রাঙাদির পাতে দিতেই উনি বললেন, কোথায় মেয়েরা রাঁধবে, তা নয়, আপনারাই আমাদের খাওয়ালেন।

থীরু বললে, ফিরে গিয়ে যখন আপনাদের বাড়ী দেখা করতে যাব, তখন এটা শোধ দিয়ে দেবেন

মুক্তোদাদা বললেন, তীর্থ করা তো নয়, এ যেন পিকনিক। লোকে বলবে কি?

হেসে ওঠে সবাই ওঁর কথা শুনে।

কুলীরাও বাদ যায়নি। জংবাহাদুর, বীরবাহাদুর, জোড়াসিং, এরা সবাই একেবারে আহ্লাদে আটখানা। ভাতের যে এমন স্বাদ হয়, তা ওরা জানত না। তা ছাড়া এরকম সহৃদয় যাত্রীর এর আগে যে ওরা সাক্ষাৎ পায়নি, সে কথা বার বার বলতে লাগল। বকশীস দেন অনেকে, কিন্তু ডেকে গাওয়া ঘি আর সরু চালের পাক ঘিভাত কেউ কখনও দেননি ওদের।

পরের দিন শোনা গেল, বাস খারাপ হয়ে যাওয়ায় আরও ত্বু' একদিন থাকতে হবে। অথচ ঘরমুখো মানুষ কি এমনিভাবে বসে থাকতে পারে। যাওয়ার ব্যাপারে ছুটি দল হল। যাঁরা হাঁটতে চান না, তাঁরা বাসের জন্যে ত্বু-একদিন এখানে থেকে যেতে প্রস্তুত। অন্যপক্ষ হেঁটে যেতে রাজী। যতটা যাওয়া যায়। আমরা শেষের দলে।

ঘোড়া, ডাণ্ডী, কাণ্ডী বাদে বাকী যাঁরা রইলেন, তাঁদের মধ্যে আমাদের দলই ভারী। সুতরাং হাঁটা সুরু হল। আমরা ঠিক করলাম বাস পথ ধরে হাঁটব। একটু বেশী হাঁটতে হয়, তা হোক। বাসের রাস্তা প্রশস্ত এবং চড়াই ও উৎরাই অনেক কম। মেয়েদের মধ্যে একা বৌরাণী রইলেন আমাদের সঙ্গে ঘোড়ায় চেপে। স্রেফ গল্প করতে করতে ষোল মাইল রাস্তা যে কি ভাবে হেঁটে পার হলাম, কেমন করে পাঁচ ঘণ্টা সময় গেল কেটে, টেরই পেলাম না।

বেলাকুচি এসে পৌছলাম যে সময়, তখন বেলা বারটা। বেলা-কুচিতে খাওয়াদাওয়া সেরে বাসে চেপে সোজা পিপলকুঠী যাবার আয়োজন। যাঁরা সাবেকী হাঁটাপথ ধরে আসছেন, তাঁরা খাওয়াদাওয়া সারবেন গোলাবকুঠি চটিতে। বেলাকুচিতে তুই দলে আবার দেখা হল। বাস চলল পিপলকুঠী।

পিপলকুঠীতে কুলীরা আমাদের ছেড়ে গেল। জংবাহাত্বর ম্লানমুখে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে, কিছু বকশিস পাবার আশায়। পাওনা

যা ছিল মোট বইবার মজুরী হিসেবে, তা পেয়ে গেছে। দোব ভাই, তোমাদের ঋণ কি বকশিস দিয়ে শোধ করা যায়? যায় না। জামা, জুতো, বর্ষাতি, যার যা মন চাইল, হাতে করে তুলে দিই ওদের। নিতান্ত দুঃখী ওরা, আবার হয়ত কোন যাত্রীর সঙ্গ নেবে, তার মোট বইবে, আর বকশিসের আশায় অমনি করে প্রতীক্ষা করবে দোর গোড়ায়। ওদের জন্যে নিমেষের তরেও যদি চোখটা ছলছলিয়ে উঠে, সেটা কি অস্বাভাবিক?

এখানেও কেনাকেটা হল। চামর, হরিণের চামড়া ইত্যাদি সুলভ না হলেও খুব দামী নয়। ভবানীপুরের রাঙাদি, মুক্তিবৌদি, আরও অনেকের বোঝা হল ভারী। সুর্মা, শিলাজিত বিশুদ্ধ কি অপরিশুদ্ধ, সে বিচারের আর মন নেই। যা হোক কিছু কিনে থলিতে ভরো, ব্যস।

পরের দিন পিপলকুঠী থেকে চমোলী পর্য্যন্ত পুরাণো রাস্তা ধরে এসে নতুন পথে নন্দপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ হয়ে শ্রীনগর। দুটি প্রয়াগেই বাস দাঁড়ায় খানিকক্ষণ। অবসর বেশী পাই না, তাই তাড়াতাড়ি ছবি তুলতে হয়। একটানা জার্ণিতে এখন আর অবসাদ নেই।

শ্রীনগরে বাস থেকে নামবার মুখে মুষলধারে বৃষ্টি। সমস্ত মালপত্তর বাক্স বিছানা ভিজে ঢোল হল বাসের ছাতে।

সেই শ্রীনগর! কমলেশ্বর শিবের মন্দির দেখতে তাঁরা ছোটেন, যাঁরা যাবার পথে সুযোগ পাননি। গল্প করতে করতে রাত কেটে গেল।

পরের দিন শ্রীনগর থেকে হৃষিকেশ। এখানে এসে দল নিয়ে থাকা দলীয় লোকেরা নির্দলীয় হল। বিরাট এক জনতা যেন ছত্রভঙ্গ হল এতদিন পরে। মলিন, অপরিচ্ছন্ন বেশভূষা পরিত্যক্ত হল।

আসলে আবার সুসভ্যতার আলোয় আলোকিত হতে, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হতেই হৃষিকেশে একদিন থাকতে হল। সেই অবকাশে বিদায় সম্ভাষণ ও ঠিকানা বদলের পালা।

আমরা ফিরে এসেছি, অথচ এখনও ৺কেদারবদরী অভিমুখে চলেছেন কত যাত্রী। নবাগত যাত্রীদের ভেতর উৎসাহ উদ্দীপনার অন্ত নেই, ঠিক যেমন আমাদের ছিল। যে মন নিয়ে প্রথম হৃষিকেশ থেকে যাত্রা সুরু করেছিলাম, আজ আর সে মন নেই। সে মনের চেহারা আজ সম্পুর্ণ বদলে গেছে। সাইটসিয়ার বুঝি পরিব্রাজকের প্রাণের ছোঁয়া পায়। ট্যুরিষ্ট বুঝি বা পায় প্রকৃত তীর্থযাত্রীর মনের পরশ। বিচিত্র ও নব নব অভিজ্ঞতার থলি ভরে নিয়ে হৃষ্টচিত্তে বাড়ীমুখো ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করি।

ভাঙ্গা হাট। 'ম' বাবুর সঙ্গে এখানেই আলাপ। তাঁর পরিবারের লোকজন আর আমরা আবার আলাদা হলাম।

রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে একটানা কু-উ-উ আওয়াজ করে ট্রেনটা চলেছে। মন্দাকিনী, অলকানন্দা এবং গঙ্গার তরঙ্গের উপলখণ্ডে ভেঙ্গে পড়ার মতো ভাবনা চিন্তার তরঙ্গ আছড়ে আছড়ে বিস্মৃতির তটে ভেঙ্গে পড়তে চায়। কিন্তু চিরন্তন পথিকের মনে বাস করে যে শিল্পী সত্ত্বা, সেটা বিস্মৃতির অতলান্তের গভীরতা থেকে ছেঁকে তোলা মধুর স্মৃতিকে অবলম্বন করেই বেঁচে থাকতে চায়। কর্মক্লান্ত জীবনে দুঃখ দৈন্যের বিক্ষোভের মাঝে আনন্দের প্রলেপ এই মধুর স্মৃতি।

'আমি কেবল আমায় নিয়ে কোন প্রাণেতে বেঁচে থাকি' বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। সত্যিই তো।